মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী

শ্রীসুকুমার সেন

বিশ্वविদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্ব-ভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

॥ ১৩৫২ ॥

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী

শ্রীসুকুমার সেন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

৬

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কি-অভিযান শুরু হল আর তার ফলে বাংলাদেশের ইতিহাস নূতনতর রূপ নিলে। গৌড়-সিংহাসন থেকে বিচ্যুত হয়েও সেন-রাজারা কিছুকাল ধরে মধ্য ও পূর্ব্ব বঙ্গে স্বাধিকার রক্ষা করতে পেরেছিলেন। পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের স্থানে স্থানে স্থানীয় শাসনকর্ত্তারাও সেন-বংশের নামে অথবা স্বনামে অল্পবিস্তর স্বাধীনতা অনেক কাল ধরে ভোগ করেছিলেন। প্রান্তীয় অঞ্চলগুলির স্বাধীনতা আরও অনেককাল অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল।

কিন্তু শেষ অবধি বিদেশী শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। তার কারণ এই নয় যে বাঙালীর বীরত্ব তখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মুসলমান-শক্তির বিজয়-লাভের প্রধানতম কারণ হচ্ছে দেশে সঙ্ঘশক্তির অভাব। পাল-রাজত্বের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশের গণশক্তি ধীরে ধীরে সঙ্ঘবদ্ধতা হারাচ্ছিল। তার উপর বল্লালসেন-লক্ষ্মণসেনের সুশাসনে দণ্ডশক্তিও উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল। সাম্রাজ্যের বলাধিকৃতেরা অস্ত্রে-শস্ত্রে যুদ্ধবিদ্যায় ও রণনীতিতে গতানুগতিকতাই স্বীকার করে আসছিলেন, তাতে যে কালানুযায়ী পরিবর্ত্তন আবশ্যক তা অনুধাবন করেন নি। সর্ব্বোপরি, আধিভৌতিক বাহুবল অপেক্ষা আধিদৈবিক মন্ত্রবলের উপর ক্রমবর্দ্ধমান আস্থা জনগণমানসে জড়তার মোহ বিস্তার করছিল। একথা বলা মূঢ়তা যে বাঙালী তখন রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে কাতর হত। তা যদি হত তবে সমগ্র বাংলাদেশকে অধিকার করতে মুসলমান-শক্তিকে দু-শ বছরের উপর লাগত না। তবে একথা অস্বীকার করলে ইতিহাসকে অবজ্ঞা করা হবে যে সেকালে মন্ত্র-তন্ত্র-স্বস্ত্যয়নের মাহাত্ম্য রণশৌর্য্যের প্রাধান্যের চেয়ে

কম ছিল না। মহাসান্ধিবিগ্রহিক যেখানে দুর্ব্বলচিত্ত সেখানে মন্ত্রণাগৃহে মৌহূর্ত্তিকের প্রভাব যে বেশি হবে তাতে বিস্ময় কি। তাই অসম অথবা বিষম বিগ্রহে গ্রহানুকূল্য ও মন্ত্রশক্তির উপর ভরসা রেখে ক্ষাত্র বাহুবল ছিল নির্ভরপ্রসুপ্ত। তুক-তাকের উপর বিশ্বাস সেকালে রাজশক্তিরও যে কতটা দৃঢ় ছিল তার একটু নিদর্শন দিচ্ছি সেকালের একটি তথাকথিত রণনীতির বই থেকে। শত্রুসৈন্য যদি চার দিক থেকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন কি কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে বইটিতে অনেক রকম বিধান আছে। তার মধ্যে একটি বলছি। শ্মশানের ছাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে বেটে তূর্য্যের গায়ে ভালো করে মাখিয়ে এই মন্ত্র পড়ে বাজাতে হবে,

> ওং অং হুং হুলিয়া হে মহেলি বিহঙ্গহি সাহিণেহি
> মশাণেহি খাহি লুঞ্চহি কিলি কিলি কালি হুং ফট্ স্বাহা।

আর শ্বেত অপরাজিতার মূল ধুতুরা-পাতার রসে বেটে নিজের কপালে তিলক এঁকে সর্ব্বজ্ঞোদয় মন্ত্র জপ করতে হবে। তা হ'লে সেই তূর্য্যের শব্দ শুনে "ভবতি পরচক্রভঙ্গঃ স্বসৈন্যবিজয়ঃ"।

সঙ্ঘশক্তির প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতা না দেখালেও ব্যক্তিগত শৌর্য্যে, সৈনাপত্যে ও রাষ্ট্রব্যবহারে বাঙালীর দক্ষতা কারো চেয়ে কম ছিল না। বাঙালী যখন ঘরে আগন্তুক বিদেশী শক্তির কাছে হেরে হেরে যাচ্ছে তখনো অন্য প্রদেশের রাজসভায় বাঙালী মনীষী সম্মানের আসন অধিকার করে রয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পরমার-বংশীয় মালব-রাজ অর্জ্জুনবর্ম্মদেবের মহামন্ত্রী ও গুরু "বালসরস্বতী" মদন ছিলেন বাঙালী, "গৌড়ান্বয়-পুলিনরাজহংসঃ"। এঁর পিতার নাম ছিল গঙ্গাধর। অর্জ্জুনবর্ম্মদেবের তিনখানি তাম্রপট্টানুশাসন মদনের রচনা। ইনি লিখেছিলেন একটি কাব্য 'বালসরস্বতীয়', আর একটি নাটিকা 'পারিজাতমঞ্জরী' বা 'বিজয়শ্রী'। সমগ্র নাটিকাখানি দুইখণ্ড সুবৃহৎ শিলাপট্টে উৎকীর্ণ হয়েছিল। প্রথমখানি পাওয়া গেছে। তাতে প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্ক মাত্র আছে।

মধ্যপ্রদেশে রায়পুরে প্রাপ্ত কলচুরি-বংশীয় রতনপুর-রাজ প্রতাপমল্লদেবের প্রশস্তিকে একটি ক্ষুদ্র কাব্য বলা চলে। এটির লিপিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। এই প্রশস্তির রচয়িতা ও লেখক ছিলেন বাঙালী কায়স্থ। ইনি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন

গৌড়ান্বয়োঽয়ং প্রতিরাজনামা বিদ্যাম্বুধিঃ শ্রীকরণপ্রদীপঃ।
স্বচ্ছাশয়ঃ সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধস্তাম্রে লিলেখ প্রকটৈস্তু বর্ণৈঃ॥

বৌদ্ধবিহার ও ব্রাহ্মণ্যমন্দিরগুলি প্রথমেই আক্রান্ত হয়েছিল তুর্কি-অভিযানকারীদের দ্বারা। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লুট, আর অবান্তর উদ্দেশ্য ছিল জাতির মর্ম্মস্থান দেবপীঠগুলির উপর আঘাত হেনে জনসাধারণের মনে ত্রাস জাগিয়ে নিশ্চেষ্ট করে দেওয়া। এই দুই উদ্দেশ্যই অল্পবিস্তর সফল হয়েছিল। বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত যাঁরা পারলেন তাঁরা প্রান্তীয় হিন্দুরাজ্যে চলে গেলেন—মিথিলায়, নেপালে, উড়িষ্যায়, কামরূপে, ঝাড়িখণ্ডে। যাঁরা পারলেন না তাঁরা পড়ে মার খেলেন। কতক বা এখানে সেখানে লুকিয়ে প্রাণ, জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা করলেন। ধর্ম্ম-ঠাকুরের ঘরভরা গাজনের শেষ অনুষ্ঠান "ঘরভাঙ্গা"-র ছড়ায় এই ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে। আমাদের দেশের চিন্তাধারার একটা সাধারণ সূত্র হচ্ছে সুখের মত দুঃখকেও ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য বিধান বলে মেনে নেওয়া। দেশ যখন মার খেয়ে খেয়ে নির্বীর্য্য হয়ে পড়ল তখনি এই পরাজিত-মনোবৃত্তি প্রকট হল ব্যাপকভাবে। তাই কিছুকাল পরে জনসাধারণ সহজেই মুসলমান-বিজয়কে ঈশ্বরের মার বলে মেনে নিয়ে মনে সান্ত্বনা আনতে চেষ্টা করলে।

কল্কি-অবতারের জন্যে তারা প্রস্তুত ছিল অনেকদিন হতে, তাই তাদের অনায়াসে বুঝিয়ে দেওয়া গেল যে

ধর্ম্ম হৈলা যবনরূপী শিরে পরে কাল টুপি
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান,
চাপিয়া উত্তম হয় দেবগণে লাগে ভয়
খোদায় হইল এক নাম।

ব্রহ্মা হৈল মোহাম্মদ বিষ্ণু হৈল পেগম্বর
মহেশ হইল বাবা আদম,
গণেশ হইল কাজী কার্ত্তিক হইল গাজী
ফকীর হইল মুনিগণ।
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইল শেখ
পুরন্দর হইল মৌলানা,
চন্দ্র সূর্য্য আদি যত পদাতিক হইয়া শত
উচ্চস্বরে বাজায় বাজনা।
দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী তেঁহ হইল হায়া বিবি
পদ্মা হইল বিবি নূর,
যতেক দেবতাগণ করিল দারুণ পণ
প্রবেশ করিল জাজপুর।

উড়িষ্যায় জাজপুরে এই দেউল-দেহারা ভাঙ্গার কাহিনী যে কনারকের সূর্য্য-দেউল ধ্বংসের স্মৃতি বহন করছে তার কিছু কিছু প্রমাণ আমি পেয়েছি। এখানে সে কথা অবান্তর। বাকি ইতিহাসটুকুও পুথি থেকে উদ্ধৃত করছি।

ব্রাহ্মণের জাতিধ্বংসহেতু নিরঞ্জন,
সাম্বাইল জাজপুরে হইয়া যবন।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে গোহাড়ের ঘায়,
হাতে পুথি কর‍্যা কত দেয়াসি পলায়।
ভালের তিলক যত পুঁছিয়া ফেলিল,
ধর্ম্মের গাজনে ভাই যবন আইল।
দেউল-দেহারা যত ছিল ঠাঁই ঠাঁই,
ভগ্ন করি পাড়ে তারে না মানে দোহাই।
ধর্ম্মের গাজনে ভাই উড়িছে বলকা,
উতরিয়া পেলে তবে যতেক পতকা।

সেইত নগরে দ্বিজ পাশাসিংহ নাম,
বেদেতে প্রতাপ অতি রূপে অনুপাম।
শুনিয়া ত ধর্ম্মরাজ কুপিল অন্তরে,
সাম্বাইল পাশা-ছলে তাহার মন্দিরে।

অতঃপর ইতিহাস-কাহিনী রূপকথায় তলিয়ে গেছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষে যখন বাংলায় স্বাধীন সুলতান-বংশের প্রতিষ্ঠা হল তখন হতে অরাজকতার অশান্তি দূর হয়ে দেশে শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পোষণের অনুকূল অবস্থা দেখা দিল। আবার অশান্তি দেখা দিয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন পাঠান-রাজশক্তি মোগল-সাম্রাজ্যশক্তির কাছে পরাজিত হচ্ছিল। সে-সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যে দুর্য্যোগ দেখা দিয়েছিল তার চমৎকার বর্ণনা পাই মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীতে। তবে বাঙ্গালী তখনো মরে নি, ধর্ম্মের নামে তখনো সে প্রাণ দিতে পারত। শ্রীচৈতন্যের এক প্রধান ভক্ত ছিলেন শ্রীখণ্ড-বাসী নরহরি সরকার। এঁর এক শিষ্য ছিলেন বৈদ্য চন্দ্রশেখর। তাঁর ঘরে রসিকরায় বিগ্রহের পূজা হত খুব ধুমধাম করে। মন্দিরের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে মোগল-সেনা করলে আক্রমণ। দেবমূর্ত্তির অঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারের বাহুল্য দেখে তারা ঠাকুর ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত হলে চন্দ্রশেখর দেবমূর্ত্তি বাঁচাতে গিয়ে অকাতরে প্রাণ দিলেন।

চন্দ্রশেখর নাম বৈদ্য আছিল খণ্ডেতে,
যার বসতবাটী খণ্ড ক্ষেত্রের তলাতে।
রসিকরায় বিগ্রহ তার সেবা অতিশয়,
স্বর্ণ-ঠাকুর বলি মোগল বেঢ়িল আলয়।
বক্ষে রাখিলা ঠাকুর তবু না ছাড়িলা,
চন্দ্রশেখরের মুণ্ড মোগলে কাটিলা॥

ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পূর্ব্ব-ভারতে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর সম্পর্ক বিষয়ে কোন বর্ণনা বাংলাদেশের সাহিত্যে বড় পাই না। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর

প্রথমার্দ্ধে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি তাঁর 'কীর্তিলতা'য় যে চিত্র এঁকেছেন তার থেকে আমরা কতকটা অনুমান করতে পারি। বিদ্যাপতি লিখেছেন,

হিন্দু তুরকে মিলল বাস,
একক ধম্মে অওকো উপহাস।
কতহুঁ বাঙ্গ কতহুঁ বেদ,
কতহু মিলিমিস[1] কতহুঁ ছেদ।
কতহুঁ ওঝা কতহুঁ খোজা,
কতহুঁ নকত কতহুঁ রোজা।
কতহুঁ তম্বারু কতহুঁ কূজা,
কতহুঁ নীমাজ কতহুঁ পূজা।
কতহুঁ তুরক বরকর,
বাট জাইতেঁ বেগার ধর।
ধরি আনএ বাঁভন-বড়ুআ,
মথাঁ চড়াবএ গাইক চুড়ুয়া।
ফোট চাট জনউ তোড়,
উপর চড়াবএ চাহ ঘোড়।
ধোআ উড়িধানে মদিরা সাঁধ,
দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ।
গোরি গোমঠ পূরলি মহী,
পএরহু দেবাক[2] ঠাম নহী।
হিন্দু বোলি দূরহি নিকার,
ছোটেও তুরুকা ভভকী মার।

---

[1] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ধৃত পাঠ 'মিসি মিল'। বস্তুত মুসলমানদের জাতিগত ঐক্য হিন্দুর চোখে বিশেষ ক'রে লেগেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে রূপরাম লিখেছেন, "এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায়"।

[2] পাঠ "দেমা এক"।

[হিন্দু ও তুরুকের বাস কাছাকাছি। কিন্তু একের ধর্ম্মে অপরের উপহাস। একের বাঙ্ (আজান), অপরের বেদ। কারো সমাজে মেলামেশা, কারো সমাজে ভেদ। একের পণ্ডিত ওঝা, অপরের পণ্ডিত খোজা। একের নকত, অপরের রোজা। একের তাম্রকুণ্ড, অপরের কুঁজা। একের নমাজ, অপরের পূজা। কত তুরুক রাস্তায় যেতে বেগার ধরে। ব্রাহ্মণ-বটুকে ধরে এনে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গোরুর রাঙ। ফোঁটা চাটে, পৈতা ছেঁড়ে, ঘোড়ার উপর চায় চড়াতে। ধোয়া উড়ি ধানে মদ চোলাই করে, দেউল ভেঙে মসজিদ বানায়। গোরে ও গোমঠে মহী হল পূর্ণ, পা দেবার একটুও স্থান নেই। হিন্দুকে বলে, দূরে নিকালো। তুরুক ছোট হলেও বড়কে মারতে যায়।]

হাটের বর্ণনা উপলক্ষে বিদ্যাপতি লিখেছেন, তুরুকেরা এমনিই কোপন-স্বভাব—“বিনু কারণহি কোহাএ বএন তাতল তমুকুত্তা”, (অর্থাৎ বিনা কারণেই তা'রা কুপিত হয় আর তাদের বদন হয় তপ্ত তামার টাটের মত লাল)। তুরুকসোয়ার হাটে ঘুরে বেড়ায় ফেরা (অর্থাৎ তোলা) মেগে ; তারা আড়দৃষ্টিতে চায়, দাড়ি আঁচড়ায়, আর থুথু ফেলে।

তুরুক-তোখারহিঁ চলল হাট ভমি ফেড়া মাঙ্গই,
আড়ী দীঠি নিহারি দবলি দাঢ়ী থুক বাহই।

সৈয়দেরা শিরনি বিলোয়, সকলের ঝুঠা সকলে খায়। দোয়া (অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ) দিয়ে কিছু না পেলে দরবেশ গাল পেড়ে চলে যায়।

সঅদ সেরনী বিলই সব্বকো জূঠ সব্বে খাই,
দোআ দে দরবেশ পাব নহি গারি পারি জাই।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে মুসলমান-বসতির উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন মুকুন্দরাম। কালকেতু গুজরাট নগর পত্তন করে তার পশ্চিম

অংশ ছেড়ে দিলে মুসলমানদের জন্যে। এই অংশের নাম হল হাসনহাটি। তখনও পাঠানদের প্রাধান্য। তাই

আপন টবর নিয়া বসিল অনেক মিঞা
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে পোঁছে হাত,
সাবানি লোহানি আর লোদানি সুরয়ানি চার
পাঠান বসিল নানা জাত।

এরা কালকেতুর প্রজা, সুতরাং সকলেই শান্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ।

ফজর সময়ে উঠি বিছায় লোহিতপাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ,
সোলেমানি মালা ধরে জপে পীর পেকম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ।
দশ-বিশ বিরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন পড়য়ে কোরান ;
কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শিরিনি বাঁটে
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান।
বড়ই দানিশমন্দ কারে নাহি করে ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাই ছাড়ি,
ধরয়ে কাম্বোজ-বেশ মাথায় না রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।[৮]

২

পাঠান সুলতানদের রাজসভায় হিন্দু আমলের ঠাঠ কিছু কিছু বজায় ছিল। রাজার খাস চিকিৎসক হতেন হিন্দু এবং পূর্ব্বেকার মতই তাঁর উপাধি ছিল "অন্তরঙ্গ"। রাজ্যশাসনে ও রাজস্বব্যবস্থায়, এমন কি সৈনাপত্যেও, হিন্দুর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সুলতান জলালু-দ্-দীনের ডান হাত ছিলেন

তাঁর এক হিন্দু মহামন্ত্রী-সেনাপতি। যে পুথিতে এঁর কথা জানা যায় তা কীটদষ্ট হওয়ায় নামটুকু মেলে নি, তা ছাড়া এঁর আর সব পরিচয় পাওয়া গেছে। এঁর পিতার নাম ছিল জগদত্ত।[১] জলালু-দ্-দীন এঁকে "রায়-রাজ্যধর" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। এঁরই অনুরোধে মহিন্তাপনীয় আচার্য্য কবিচক্রবর্ত্তী বৃহস্পতি-মিশ্র 'স্মৃতিরত্নহার' লিখেছিলেন। তাতে এঁর যে প্রশস্তি আছে তা এখানে উদ্ধৃত করছি।

জীয়াদয়ং স জগদত্ত-সুতোঽতিবেল-
স্তৈস্তৈর্গুণৈঃ [উপচিতৈর্বিনয়প্রধানৈঃ][২]।
[সুক্ষত্র-]পা নিজভুজদ্রবিণার্জিতশ্রীঃ
শ্রীরায়রাজ্যধরনাম পদং প্রপন্নঃ ॥

[জগদত্তের সেই সেই গুণে সর্ব্বাতিশায়ী এই পুত্র দীর্ঘজীবী হোন।······ নিজ ভুজবলে লক্ষ্মীলাভ করে যিনি শ্রীরায়-রাজ্যধর[২] পদবী প্রাপ্ত হয়েছেন।]

যো ব্রহ্মাণ্ড[ং] কনকতুরগস্যন্দনং বিশ্বচক্রং
পৃথ্বীং কৃষ্ণাজি[ন]সুরতরূন্ ধেনুশৈলোদরীংশ্চ।
[প্রাদান্নিত্যং] [বি]ধিবদবনীদেবতানামমন্দং
ভিন্দন্ দৈন্যং সপদি দধতে ধর্ম্মসূনোরভিখ্যাম্ ॥

[তিনি······বিধিমতে ভূমিদেব ব্রাহ্মণদের দৈন্য অকাতরে দূর করে দিয়ে ধর্ম্মপুত্র আখ্যা লাভ করেছিলেন।]

জন্মাপ্তং জগদত্ততো গুণনিধের্মূর্দ্ধাভি[ষিক্তা]ন্বয়ে
দারাঃ সন্ততি-[ভোগগৌরবত]তিঃ শ্রীভাস্করাঃ সূনবঃ।
লক্ষ্মীরদ্ভুতদানভোগসুভগা মন্ত্রিত্বমুর্ব্বীভুজা-
মিত্থং যস্য মনোরথায় কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন কাম্যং স্থিতম্ ॥

[গুণনিধি তাঁর জন্ম হয়েছিল রাজবংশে, জগদত্তের ঔরসে। তাঁর পত্নী

[১] পাঠ সর্ব্বত্র 'জগদন্ত'।
[২] মূলে সর্ব্বত্র বন্ধনীস্থিত পাঠ আমার কল্পিত।

ছিলেন সন্তানসৌভাগ্যবতী। পুত্রেরা শ্রীমান্ (অথবা শ্রীভাস্কর প্রভৃতি তাঁর পুত্র)। ঐশ্বর্য্য তাঁর সফল হয়েছিল অদ্ভুত দানে ও ভোগে। লাভ হয়েছিল তাঁর রাজাদের মন্ত্রিত্ব। তাই সেই কৃতী ব্যক্তির মানসে কাম্য আর কিছুই ছিল না।]

"মহিন্তাপনীয় কবিচক্রবর্ত্তী-রাজপণ্ডিত-পণ্ডিতসার্ব্বভৌম-কবিপণ্ডিতচূড়ামণি-মহাচার্য্য-রায়-মুকুটমণি" বৃহস্পতি-মিশ্রের মনীষা সুলতান জলালু-দ্-দীনের কাছে বিশেষ সম্মাননা লাভ করেছিল। ইনি তখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। 'স্মৃতিরত্নহার' ছাড়া ইনি 'ব্যাখ্যাবৃহস্পতি' (রঘুবংশের ও কুমারসম্ভবের টীকা) এবং 'নির্ণয়বৃহস্পতি' (শিশুপালবধের টীকা) প্রভৃতি বই লিখেছিলেন। এঁর শেষ রচনা বোধ হয় 'পদচন্দ্রিকা' (অমরকোষের টীকা)। পদচন্দ্রিকার রচনাকাল ১৩৫৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দ। বৃহস্পতির মন্ত্রণায় একাধিক গৌড়েশ্বর উপকৃত হয়েছিলেন তাই তাঁর উপর পর-পর অতগুলি উপাধি ও তার আনুষঙ্গিক উপায়ন বর্ষিত হয়েছিল। এঁর ছেলেরাও ছিল রাজমন্ত্রী ও প্রসিদ্ধ বিদ্বান্। নিজের রচনায় টুকরো-টুকরো ভাবে বৃহস্পতি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এর থেকে সেই স্বল্পজ্ঞাতযুগের একজন বিখ্যাত বাঙালীর পরিচয় পাই।

শ্রীবৎসলাঞ্ছনপদদ্বয়পদ্মভৃঙ্গাদ্
গঙ্গাপয়োম্বহবিগাহনহীনপঙ্কাৎ।
মায়াপ্রতিগ্রহনিবর্ত্তনসৎপ্রতিজ্ঞাদ্
গোবিন্দনামজনকাজ্জনকানুকারাৎ॥

[বিষ্ণুপাদপদ্মের যিনি ছিলেন ভৃঙ্গস্বরূপ, প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যাঁর পাপ বিদূরিত হয়েছিল, যিনি সাংসারিক প্রতিগ্রহবিমুখতায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, যিনি ছিলেন জনকের তুল্য, এমন গোবিন্দ নামক জনকের ঔরসে—]

ভর্তৃব্রতাগণশিরোমণিতাং গতায়াঃ
সীমন্তিনীগণশতৈরপি নন্দিতায়াঃ।

দানব্রতৌঘবিধিসাধিতকীর্ত্তিসীম্নো
মাতুশ্চ [স্বর্গজিত] নীলসুখায়ী[১]-দেব্যাঃ ॥

[যিনি ছিলেন পতিব্রতাগণের শিরোমণি, শত শত সীমন্তিনীগণ যাঁকে সংবর্দ্ধনা করত, অজস্র ব্রতে ও দানে যাঁর কীর্ত্তি সীমা লঙ্ঘন করেছিল, এমন··· নীলসুখায়ী[১] দেবীর গর্ভে—]

যোঽভূদ্ যস্য চ যোষিদদ্ভুতগুণা ভূয়ো রমা নির্বৃতা
ধত্তে যঃ কবিচক্রবর্ত্তিপদবীমাচার্য্যবর্য্যশ্চ যঃ।
রাঢ়ায়ামপি গাঢ়নির্ম্মলকুলচ্ছত্রং কুলীনাগ্রণী-
র্যঃ প্রাপৎ প্রণতঃ পরং হরিপদদ্বন্দ্বারবিন্দে চ যঃ ॥

[তিনি জন্মেছিলেন। বহু-অদ্ভুতগুণবতী লক্ষ্মীরূপা নির্বৃতা[২] ছিলেন তাঁর ভার্য্যা। তিনি ছিলেন আচার্য্যশ্রেষ্ঠ এবং পদবী পেয়েছিলেন কবিচক্রবর্ত্তী। কুলীনদের মধ্যে অগ্রণী তিনি রাঢ়দেশে অত্যন্তনির্মল কুলশীলের জন্য ছত্র (অর্থাৎ নেতৃত্ব) লাভ করেছিলেন। তিনি হরিপাদপদ্মে সর্ব্বদা প্রণত হয়ে থাকতেন।]

সন্দর্ভশুদ্ধিমধিগম্য গিরাং গুরোঃ যঃ
শ্রীশ্রীধরাদ্ বিধৃতমিশ্রপদঃ সুমিত্রাৎ।
বিদ্যাসু তাসু সুকৃতী বিনয়ী[৩] গুণেষু
গৌড়াধিপাদুপচিতপ্রচুরপ্রতিষ্ঠঃ ॥

[সুমিত্র গুরু শ্রীধরের কাছ থেকে তিনি বাগ্‌বিশুদ্ধি এবং মিশ্র উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সকল বিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং গুণসত্ত্বেও বিনয়ী। গৌড়াধিপের নিকট তিনি লাভ করেছিলেন প্রচুর প্রতিষ্ঠা।]

---

[১] পাঠান্তর "নীলমুখায়ী"। প্রকৃত পাঠ শীলসুখায়ী হতেও পারে। [২] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভুল করে মনে করেছিলেন এঁর নাম রমা। কিন্তু আসলে নাম যে নির্বৃতা তা স্পষ্ট করে বোঝা যায় রঘুবংশ-টীকা থেকে, "যস্যোচিতা প্রিয়তমা প্রতিমানবৃত্তিমূর্ত্তেব নির্বৃতিরভূদ্ ভুবি নির্বৃতেতি"॥
[৩] পাঠান্তর "বিদ্যাসু তাসু বিনয়ী প্রণয়ী," "বিদ্বৎসভাসু বিনয়ী প্রণয়ী"।

জ্যোতিষ্মন্মণিপুঞ্জরঞ্জনরুচিং হারং জ্বলৎকুণ্ডলে
রত্নোপচ্ছুরিতা দশাঙ্গুলিজুষঃ শোচিষ্মতীরূর্মিকাঃ।
যঃ প্রাপ্য দ্বিরদোপবিষ্টকনকস্নানৈরবিন্দন্নৃপা-
চ্ছত্রৈস্তৈস্তুরগৈশ্চ রায়মুকুটাভিখ্যামভিখ্যাবতীম্॥

[উজ্জ্বলমণিময় হার, দ্যুতিমান্ কুণ্ডলদ্বয়, দশ আঙুলে পরবার রত্নখচিত ভাস্বর ঊর্মিকা (রতনচূড়) তিনি পেয়েছিলেন। তারপর নৃপতি তাঁকে হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করে স্বর্ণকলসের জলে অভিষেক করিয়ে ছত্র ও তুরগ সমেত শোভাময় রায়মুকুট উপাধি দান করেছিলেন।]

যৎপুত্রা নৃপমন্ত্রিমূলমণয়ো বিশ্রাম[১]-রামাদয়ঃ
খ্যাতা দিগ্‌জয়িনামপীহ জয়িনো লোকে কবীন্দ্রাশ্চ যে।
ব্রহ্মাণ্ডামরপাদপাদিসহিতং যেহতুস্তুলাপূরুষং
তত্তদ্‌গ্রন্থবিশেষনির্মিতকৃতঃ কৃৎস্নেষু শাস্ত্রেষু তে॥

[যাঁর বিশ্রাম ও রাম প্রভৃতি পুত্রেরা ছিলেন রাজার মন্ত্রীদের মধ্যে মুখ্য। দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ও কবীন্দ্র বলে তাঁদের খ্যাতি ছড়িয়ে ছিল দেশে বিদেশে। পশুপক্ষিবৃক্ষসমন্বিত-ভূমিদক্ষিণাযুক্ত তুলাপুরুষ দান অনুষ্ঠান করেছিলেন তাঁরা। বিভিন্ন শাস্ত্রেরও বিবিধ নিবন্ধ রচনা করেছিলেন।]

পুণ্যাং পণ্ডিতসার্ব্বভৌমপদবীং গৌড়াবনীবাসবাদ্
যঃ প্রাপ্তঃ প্রথিতো বৃহস্পতিরিতি ক্ষ্মালোকবাচস্পতিঃ।
কোষস্যামরনির্মিতস্য বিবিধব্যাখ্যানদীক্ষাগুরুঃ
সানন্দং পদচন্দ্রিকাং স কুরুতে টীকামিমাং কীর্ত্তয়ে॥

[তিনি গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে পণ্ডিতসার্ব্বভৌম এই পুণ্য উপাধি পেয়েছিলেন। মর্ত্ত্যলোকের বাক্‌পতি তিনি বৃহস্পতি নামে প্রখ্যাত ছিলেন। বিবিধ

[১] পাঠান্তর "বিশ্বাস"।

শাস্ত্রের বিচারে তিনি ছিলেন সকলের গুরু। তিনি কীর্ত্তির জন্য মনের আনন্দে অমরকোষের এই পদচন্দ্রিকা টীকা রচনা করছেন।]

বৃহস্পতি ছিলেন পরমবৈষ্ণব। তাঁর শেষ গ্রন্থ পদচন্দ্রিকা ছাড়া অন্যত্র প্রারম্ভে বিষ্ণুবন্দনা ও বিষ্ণুভক্তির মাহাত্ম্যখ্যাপন পাই। যেমন নির্ণয়বৃহস্পতির প্রথম শ্লোক,

নিঃশেষবাঞ্ছিতফলার্পণকল্পবল্লী
মোহান্ধকারহরণার্কমরীচিমালা।
উদ্দামচিত্তমৃগবন্ধনবাগুরোচ্চৈ-
রুজ্জৃম্ভতাং ভগবতী মম বিষ্ণুভক্তিঃ॥

[মনোভিলাষ সম্পূর্ণভাবে পূরণ করবার যিনি কল্পবৃক্ষ, অজ্ঞানান্ধকার দূর করবার যিনি সূর্য্যরশ্মি, উদ্দামচিত্তরূপ মৃগকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করবার যিনি জাল বিশেষ, এমন ভগবতী বিষ্ণুভক্তি আমার (চিত্তে) উদিত হোন।]

পদচন্দ্রিকা-রচনার কালে হয়ত বৃহস্পতি সুলতানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যে এসেছিলেন তাই বন্দনায় তিনি নির্গুণ ব্রহ্মের স্তব করেছেন,

অধ্যাস্তে যঃ সর্বং ধ্রুব ঈদৃশ ইত্যগোচরো বচসঃ।
অহমিতি-সংবিদ্‌বিষয়ঃ পুরুষঃ স পরঃ পুরাতনো জয়তি॥

[ধ্রুব যিনি সকল ব্যাপ্ত করে আছেন, 'এইরকম'—এই বাক্য দ্বারা যাঁকে নির্দ্দেশ করা যায় না, যিনি অহম্ এই বিজ্ঞানের বিষয়, সেই পুরাতন পরমপুরুষের জয় হোক।]

সম্ভবত অনুরূপ কারণেই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসা খান মস্‌নদ-আলির সভাপণ্ডিত মথুরেশও শব্দরত্নাবলীর গোড়ায় ব্রহ্মের বন্দনা করেছিলেন।

বন্দে সদানন্দময়ং সমস্তাজ্
জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম ভবাদিসেব্যম্।

ধ্যানৈকগম্যং জগদেকরম্যং
যদিচ্ছয়া কারণকার্য্যভাবঃ ॥

[আমি বন্দনা করি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত জ্যোতি সদানন্দময় পরব্রহ্ম, যাঁকে শিব প্রভৃতি সেবা করেন, যিনি শুধু ধ্যানে লভ্য, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র রমণীয় বস্তু, যাঁর ইচ্ছায় কার্য্যকারণশৃঙ্খলা চলেছে।]

৩

বৃহস্পতির পরে নাম করতে হয় সনাতন-রূপের। এই দুই মহাপণ্ডিত ও মহাকবি ভাই ছিলেন বাংলার খ্যাতনামা সুলতান হোসেন শাহের দুই হাত। সনাতন ছিলেন "দবীর-খাস্" অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্রেটারি, রূপ ছিলেন "সাকর-মল্লিক" অর্থাৎ সর্ব্বাধিকারী বা চীফ্-সেক্রেটারী। এঁদের আত্মীয়স্বজনও উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভ করে কিরূপে দুই ভাই সংসারসম্পদ্ ছেড়ে কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন সে কথা প্রায় সকলেরই জানা আছে। এখানে আমি শুধু এঁদের পূর্ব্বপুরুষের অল্প কিছু পরিচয় দেব। এই পরিচয় দিয়ে গেছেন এঁদের যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামী।

এঁরা ছিলেন ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। এঁদের পূর্ব্বপুরুষ অনিরুদ্ধদেব কর্ণাটদেশের রাজা বা ভূমিপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে ইনি দুই পুত্রের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিয়ে যান। কিছুকাল পরে শাস্ত্রচর্চ্চাপরায়ণ জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে বঞ্চিত করে শাস্ত্রনিপুণ কনিষ্ঠ হরিহর সমগ্র রাজ্য অধিকার করায় রূপেশ্বর পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তদেশে শিখরভূমিতে এসে বাস করেন। এঁর পুত্র পদ্মনাভ "সুরতরঙ্গিণীনিবাসপর্য্যুৎসুক" হয়ে রাজা দনুজমর্দ্দনের অনুরোধে নবহট্টক গ্রামে (কাটোয়ার কিছু উত্তরে নৈহাটিতে) এসে বাস করেন। সেখানে তিনি খুব ধুমধাম করে বিষ্ণুসেবা করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে পদ্মনাভের আঠারো কন্যা ও পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দের পুত্র কুমার পারিবারিক কারণে ("কঞ্চিৎ দ্রোহমবাপ্য") বঙ্গদেশে চলে যান ("সৎকুলজনির্ব্বাণালয়ং সঙ্গতঃ")

—বোধ হয় শ্বশুরবাড়িতে। কুমারের তিন পুত্র—সনাতন, রূপ এবং বল্লভ। বল্লভের পুত্র জীব। সনাতন রূপ ও জীবের জীবনকাহিনী সুপরিচিত।

উচ্চ ও নিম্ন রাজকার্য্যে, বিশেষ করে রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপারে এবং জমিদারী পরিচালনায়, কায়স্থদের প্রভাব ছিল সর্ব্বাধিক। রুক্‌নু-দ্-দীন বার্‌বক শাহের এক প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন কুলীনগ্রামের মালাধর বসু, যাঁকে সুলতান উপাধি দিয়েছিলেন "গুণরাজ খাঁ"। এঁর বংশধরগণ বহুকাল অবধি গৌড়-দফ্‌তরে কাজ করে গেছেন। এইজন্যেই রূপরাম তাঁর ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে গৌড়ের সভায় "কুলীনগ্রামের বসুবর্ণ বকশী"-দের উল্লেখ করে বলেছেন "কায়স্থ কারকুন যত করে লেখাপড়া"। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে সনাতনের মনে বৈরাগ্য উদয় হলে তিনি যখন রাজকার্য্য একরকম ছেড়ে দিলেন তখন "লেভ কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।"

শুধু রাজকার্য্যে নয় সৈনাপত্যে আর দেশশাসনেও কায়স্থের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। হোসেন শাহের এক সেনাপতি ("লস্কর") রামচন্দ্র খান ছিলেন কায়স্থ। ইনি রাজ্যের দক্ষিণ অংশের অধিকারী ছিলেন। সন্ন্যাস করে শ্রীচৈতন্য যখন ছত্রভোগ দিয়ে নীলাচলে যান তখন এঁরই সাহায্যে গৌড়-উড়িষ্যার সীমান্ত তিনি সহজে পার হতে পেরেছিলেন। তখন হোসেন শাহের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের সংঘর্ষ চলছে। সীমান্তে উভয় পক্ষেরই শূল পোতা ছিল অপর পক্ষের চরদের প্রাণদণ্ডের জন্যে। মহাপ্রভু নীলাচল যাবেন শুনে রামচন্দ্র খান এই বলে তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন,

সভে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়,
সে-দেশে এ-দেশে কেহ পথ নাহি বয়।
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে,
পথিক পাইলে জাসু বলি লয় প্রাণে।
কোন দিগ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া,
তাহাতে ডরাঙ প্রভু শুন মন দিয়া।

মুঞি সে নস্কর এথা সব মোর ভার,
নাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার।

দোষ থাকলেও শাসনকর্ত্তারা কায়স্থকে তার কূটবুদ্ধি আর প্রতাপের জ
পীড়ন করতে সহজে অগ্রসর হত না। রঘুনাথ দাসের জ্যেষ্ঠতাত মজুমদার হির
দাস ও পিতা গোবর্দ্ধন দাস ছিলেন বড় জমিদার। তাঁদের আদায় ছিল বি
লাথ আর খাজনা দিতে হত বার লাথ। সপ্তগ্রাম-মুলুকের চৌধুরী আ
এই সম্পত্তি খাসে ভোগ করত। সে বেগতিক দেখে

রাজঘরে কৈফিতি দিয়া উজীর আনিল,
হিরণ্য মজুমদার পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল।
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা,
বাপ-জ্যেঠা আনহ নহে পাইবি যাতনা।···
বিশেষে কায়স্থবুত্তি অন্তরে করে ডর,
মুখে তর্জ্জগর্জ্জ করে মারিতে সভয় অন্তর।

রাজকার্য্যে অন্য জাতিও সমান সুযোগ লাভ করত। শ্রীখণ্ড অঞ্চলের বহু বৈ
গৌড়-সরকারে কাজ করত। তার মধ্যে একজন ছিলেন মহাকবি দামোদর
ইনি দরবার থেকে "যশোরাজ-খান" উপাধি পেয়েছিলেন। দামোদরেরই দৌহি
বিখ্যাত পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ। যশোরাজ-খান তাঁর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্
হোসেন শাহের নাম করেছেন।

গৌড়-দরবারের এক কর্ম্মচারী কুলধর ছিলেন জাতিতে বণিক্। সুলতা
এঁকে প্রথমে "সত্য-খান" ও পরে "শুভরাজ-খান" উপাধি দিয়েছিলেন। ইঁ
গোবর্দ্ধন পাঠককে দিয়ে ১৩৯৬ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৪৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) একটি পুরাণ
স্মৃতি-সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়েছিলেন 'পুরাণসর্ব্বস্ব' নামে। এতে এঁর বং
পরিচয় দেওয়া আছে তা এখানে উদ্ধৃত করছি।

গৌড়ে শ্রীবিদিতে বরেন্দ্রবিষয়ে যোঽভূদ্ বণিগ্‌বংশজঃ
সত্যাচারপরোন্নতির্গজগতিঃ সন্নীতিবিদ্যারতিঃ।

তৎসূনোঃ পুরুষোত্তমাৎ সুবিনয়াধানাৎ সমুৎপন্নবান্
বিদ্বান্ দীনদয়াসমন্বিতঃ কুলধরো ধ্যাতৈকধর্ম্মব্রতঃ ॥

[শ্রীমান্ গৌড়দেশে বরেন্দ্রবিষয়ে বণিক্‌বংশে যিনি সত্যাচারপরায়ণ, নীতিজ্ঞ, বিদ্যাবান্ গঙ্গগতি ছিলেন, তাঁর সুবিনয়শিক্ষিত পুত্র পুরুষোত্তম হতে বিদ্বান্, দীনদয়াময়, ধর্ম্মপরায়ণ কুলধর জন্মেছিলেন।]

শ্রীমদ্‌গৌড়মহীমহীপতিপতিপ্রাপ্তপ্রসাদোদয়ঃ
পুণ্যাৎ প্রাক্তনকর্ম্মণোঽতিপদবী শ্রীসত্যখানাঙ্কিতা।
পশ্চাৎ শ্রীশুভরাজখানপদবী লব্ধা ধরামণ্ডলে
জীয়াদ্ধর্ম্মধুরন্ধরঃ কুলধরো ধীরো গভীরো গুণৈঃ ॥

[শ্রীমান্ গৌড়-রাজচক্রবর্ত্তীর কাছ থেকে অনুগ্রহসম্পদ লাভ করে পূর্ব্বজন্মের পুণ্যবলে যিনি পৃথিবীতে (প্রথমে) "সত্য-খান" এই উচ্চ উপাধি এবং পরে "শুভরাজ-খান" পদবী প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই ধর্ম্মধুরন্ধর ধীর গুণগভীর কুলধরের জয় হোক।]

রাজসভার পোষকতায়ই বাংলাদেশে সংস্কৃত ও লৌকিক পুরাণ এবং সাধারণ সাহিত্যের চর্চ্চা চলতে থাকে। মধ্যযুগের পৌরাণিক বাংলা সাহিত্য প্রধানত রাজসভাশ্রিত বললে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশে কৃষ্ণলীলা বহুকাল থেকেই প্রচারিত ছিল। এই কাহিনীর আকর ছিল দুটি, এক সংস্কৃত পুরাণ—হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি আর দেশীয় লৌকিক কাহিনী, রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা যার প্রধান বক্তব্য ছিল। শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ বাংলাদেশে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে বহু পুরাণের উল্লেখ আছে কিন্তু ভাগবতের নেই। বৃহস্পতির পদচন্দ্রিকাতেও নেই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্ভবত মাধবেন্দ্রপুরীর দ্বারা বাংলাদেশে ভাগবতের প্রসার হয়েছিল। গৌড়-দরবারের কর্ম্মচারীদের মধ্যেই প্রথম ভাগবতের আদর হয়। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রধানত শ্রীমদ্‌ভাগবত

অবলম্বনে রচিত। দবীরখাস সনাতনের জন্য লিখিত ভাগবতের পুথি পাওয়া গেছে।

হোসেন শাহের কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেক কবি-পণ্ডিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন দবীরখাস সনাতন, সাকরমল্লিক রূপ, কেশব-খান ছত্রী, রামচন্দ্র-খান, যশোরাজ-খান ইত্যাদি। হোসেন শাহের পুত্র নসীরু-দ্-দীন নসরৎ শাহের অনুগত ছিলেন "কবিশেখর"-উপাধিক দেবকীনন্দন সিংহ। নসরৎ শাহের পুত্র অলাউ-দ্-দীন ফীরুজ শাহ্ শ্রীধর ব্রাহ্মণকে দিয়ে বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখিয়েছিলেন। হোসেন শাহের সেনাপতি লস্কর পরাগল-খান এবং তৎপুত্র "ছুটিখান"-ও বাঙালী কবির পরিপোষণ করেছিলেন।

পাঠান-সুলতানি শেষ হলেও বাংলাদেশের পূর্ব্ব উত্তরপূর্ব্ব দক্ষিণপূর্ব্ব ও দক্ষিণপশ্চিম সীমান্তে স্থানে স্থানে হিন্দু ও মুসলমান স্বাধীনতা বজায় ছিল। এই সব রাজা-জমিদার সকলেই যে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ছিলেন তা হয়ত নয়। কিন্তু আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রব্যাপারে এঁদের কর্ত্তৃত্ব ছিল অবাধ। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দেখি যে এইসকল প্রান্তীয় রাজসভায় বাংলা পৌরাণিক ও রোমান্টিক কাব্যের চর্চ্চা অব্যাহতভাবে চলেছে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা আশ্রিত কবি-পণ্ডিতদের দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণলীলা পাঁচালী রচনা করিয়েছিলেন। মহাভারত-পাঁচালী রচয়িতা অনিরুদ্ধ রামসরস্বতী নরনারায়ণের সম্বন্ধে লিখেছেন,

জয় নরনারায়ণ নৃপতিপ্রধান,
যাহার সমান রাজা নাহিক যে আন।
ধর্ম্মনীতি পুরাণ ভারত শাস্ত্র যত,
অহোরাত্রি বিচারন্ত কবিয়ে সতত।
গৌড়ে কামরূপে যত পণ্ডিত আছিল,
সবাকো আনিয়া শাস্ত্র-দেওয়ান পাতিল।

কবি সবে শাস্ত্র বাখানন্ত সদা তাত,
আমাকো আনাইয়া থৈয়া আছন্ত সভাত।

নরনারায়ণের অনুজ যুবরাজ শুক্লধ্বজ ("চিলারায়") দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন। শাস্ত্রে এবং শস্ত্রে তাঁর তুল্য অনুরাগ ছিল। মহাভারত-পাঁচালী রচনায় তাঁর আগ্রহই বিশেষ কার্য্যকর হয়েছিল। রাম সরস্বতী লিখেছেন,

শুক্লধ্বজ অনুজ যাহার যুবরাজ,
পরমগহন অতি অদ্ভুত কাজ।
তেঁহো মোক বুলিলন্ত মহাহর্ষমনে,
ভারত-পয়ার তুমি করিয়ো যতনে।
আমার ঘরত আছে ভারত প্রশস্ত;
নিয়োক আপন গৃহে দিলোহোঁ সমস্ত।
এহা বুলি রাজা পাছে বলধি যোড়াই,
পাঠাইল পুস্তক আমাসাক ঠাই।
খাইবার সকল দ্রব্য দিলন্ত অপার,
দাসদাসী দিলা নাম করাইলা আমার।

আসামে ও উত্তরপূর্ব্ব বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান প্রচারক শঙ্করদেবও নরনারায়ণ ও তাঁর ভ্রাতার আশ্রয়ে থেকে একাধিক পাঁচালী ও নাট-পালা রচনা করেছিলেন।

কোচবিহার-রাজবংশে বিদ্বৎপ্রিয়তা বরাবর চলে এসেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বারাণসীবাসী পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ 'প্রাণাভরণ' কাব্য লিখে মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রশস্তি গেয়েছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা পরম বৈষ্ণব হয়ে পড়েন; তাঁরা শুধু বৈষ্ণবধর্ম্মেরই নয় বাংলাসাহিত্যেরও বিশেষ পোষকতা করে গিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দক্ষিণপশ্চিম রাঢ়ে এমন কবি ছিলেন-না যিনি মল্লরাজবংশের প্রশংসা গান নি। মল্ল-রাজারা ও রাজান্তঃপুরের মহিলারা বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুশিক্ষিত ছিলেন।

ব্রাহ্মণ রাজা-জমিদারেরা অনেকে শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি হতেন। পূর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যদেব নিজে সুকবি ছিলেন। ইনি 'সংকাব্য-রত্নাকর' নামে এক কাব্যসংকলন গ্রন্থ করেছিলেন। এঁর সভায় ন্যায়শাস্ত্রেরও খুব চর্চ্চা হত। লক্ষ্মণমাণিক্যদেবের সভাকবি "কবিতার্কিক" তাঁর 'কৌতুকরত্নাকর' প্রহসনের প্রারম্ভে ভুলুয়া রাজধানীর ও রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যদেবের প্রচুর প্রশংসা করেছেন।

মুসলমান ভূমিপতিরাও নিজের নিজের সভায় কবি পণ্ডিত পোষণ করতেন। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই মথুরেশের শব্দরত্নাবলীতে। শব্দরত্নাবলী অভিধানের বই। মথুরেশ ছিলেন সুলেমান-খানের পৌত্র, ইশা-খানের পুত্র মুসা-খান মস্নদ্-আলির সভাপণ্ডিত। শব্দরত্নাবলীর উপক্রমে ও উপসংহারে মথুরেশ মুসা-খানের, ও তাঁর ভ্রাতৃবর্গের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে। যেমন,

যল্লক্ষ্মীর্ব্বৈরিণাং কুলবধূসিন্দূরবিধ্বংসিনী
যদ্বাণী ললিতা সতাং গুণবতামানন্দকল্লোলিনী।
যদ্বৃন্দোত্তরকল্পনা বিজয়িনী কর্ণাদিপৃথ্বীভুজাং
সোঽয়ং শ্রীমশনন্দএল্লিনৃপতির্জীয়াচ্ চিরং ভূতলে॥

[যাঁর সৌভাগ্যে প্রধান শত্রুবর্গের কুলবধূদের সিঁদূর মুছে যায়, যাঁর ললিতবাণী সৎ ও গুণবান্ লোকের হৃদয়ে আনন্দনদী বইয়ে দেয়, যাঁর দানপ্রাচুর্য্য কর্ণ প্রভৃতি রাজাদের (যশ) পরাজিত করেছে, এই সেই শ্রীমস্নদ্-আলি নৃপতি পৃথিবীতে চিরজীবী হোন।]

শ্রীমৎখানমহম্মদস্তদনুজো মধ্যাহ্নচণ্ডদ্যুতি-
র্বৈরিপ্রৌঢ়িঘনান্ধকারশমনো গাম্ভীর্য্যধৈর্য্যোন্নতিঃ।
শশ্বদ্দিগ্ বিজয়ী মহেন্দ্রসদৃশঃ সোঽয়ং চিরং জীবতাদ্
যদ্বক্ত্রস্মিতবীক্ষিতান্যনিতরাং ধ্যায়ন্তি দিগ্ যোষিতঃ॥

[তাঁর অনুজ শ্রীমহম্মদ-খান হচ্ছেন মধ্যাহ্নসূর্য্যের মত প্রচণ্ড এবং শত্রুবর্গরূপ-

গাঢ়ান্ধকারের শমনস্বরূপ। তিনি গাম্ভীর্য্যে ও ধৈর্য্যে উন্নত। সর্ব্বদা দিগ্‌বিজয়ী ইন্দ্র সদৃশ তিনি। তিনিও চিরকাল বেঁচে থাকুন, যাঁর মুখের হাসি ও কটাক্ষ দিগ্‌বধূগণ মধ্যে মধ্যে স্মরণ করে থাকে (বিদ্যুৎস্ফুরণের দ্বারা।)]

এতাস্মাদনুজশ্চিরং বিজয়তাং বীরেন্দ্রচূড়ামণিঃ
শ্রীমৎকামসহোদরোঽতিরসিকঃ খানাবতুল্লাহ্বয়ঃ।
উদ্যদ্‌ভীমগজেন্দ্রবাজিতরণীসঙ্গী নমৎকার্ম্মুকো
যদ্‌ভ্রূভঙ্গতরঙ্গিতৈর্বিচলিতাঃ প্রত্যর্থিপৃথ্বীভুজঃ॥

[চিরকাল বিজয়ী হোন এঁর অনুজ আবতুল্লা খান যিনি বীরেন্দ্রচূড়ামণি, কন্দর্পসহোহর, অতি রসিক। তিনি ধনু উদ্যত করেই আছেন, আর তাঁর সঙ্গী হচ্ছে যুদ্ধোদ্যত ভীম গজ-বাজি-তরণীশ্রেণী। তাঁর ভ্রূভঙ্গের তরঙ্গে বিচলিত হয়ে ওঠে শত্রু নৃপতিরা।]

তস্মাদপ্যনুজাঃ কৃপার্জ্জুনবলিদ্রোণাগ্নিকর্ণোপমা
যুদ্ধানন্দ··················সানন্দমত্যুন্নতাঃ।
সৌভ্রাত্রেণ চিরং জয়ন্তি নিতরামন্যোন্যমুৎকণ্ঠিতাঃ
সন্তোষং দধতু ক্ষিতিপ্রণয়নে দীর্ঘায়ুবিত্তোৎসবৈঃ॥

[তাঁরও অনুজেরা কৃপ অর্জ্জুন বলি দ্রোণ অগ্নি ও কর্ণের মত যুদ্ধকার্য্যে সমুৎসুক, সানন্দ এবং অত্যুন্নত। পরস্পরের জন্য উৎকণ্ঠিত এঁদের সৌভ্রাত্র্যের চিরকাল জয় হোক। রাজ্যশাসনে এঁরা দীর্ঘায়ু, বিত্ত এবং উৎসবের দ্বারা (প্রজাবর্গের) সন্তোষ বিধান করুন।]

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরাকান-রাজসভায় বহু বাঙালী গুণী আশ্রয় পেয়েছিল। দু-জন প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি—দৌলৎ কাজী আর সৈয়দ আলাওল—রোসাঙ্গ-রাজসভার গৌরব বাড়িয়ে গেছেন। এঁদের পূর্ব্বেকার একজন মুসলমান কবির লেখা বিদ্যাসুন্দর কাব্য পাওয়া গেছে। কবির নাম শাবিরিদ-খান। সম্ভবত ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষে জীবিত ছিলেন। এই মুসলমান কবিদের দ্বারাই বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্যের প্রচলন হয়।

৫

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাংলাদেশের ইতিহাসে সব চেয়ে বড় ঘটনা। ভক্তির বাঁধনে বাঁধা পড়ে বাঙালী জাতি অখণ্ড রূপ নিলে। বাঙালীর জীবনে এল নবজাগরণ। অধ্যাত্মচর্য্যায় আর সাহিত্যের অনুশীলনে এই জাগরণের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। আর পাই সঙ্গীতে, অর্থাৎ কীর্ত্তনগানের বিকাশে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও জাগরণ দেখা দিত, যদি না ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঠান রাজশক্তির লোপ ঘটত। সংস্কৃতির দিক দিয়ে শ্রীচৈতন্য প্রান্তীয় বাংলা-দেশকে ভারতবর্ষের সঙ্গে জুড়ে দিলেন, আর আকবর বাংলাদেশ জয় করে তাকে মোগল সাম্রাজ্যের অংশবিশেষে পরিণত করলেন। অতঃপর রাজশক্তির নজর রইল শুধু রাজস্বের সংগ্রহে। দেশীয় সংস্কৃতির স্বাধীন অনুশীলনের পথ হ'ল রুদ্ধ। দেশের বাহুবলও মোগলশক্তিরূপ জুজুর ভয়ে ক্রমশ অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়তে লাগল। এই ব্যাপারে ভক্তিধর্ম্মের প্রসারও কতকটা দায়ী।

শ্রীচৈতন্য নিজে যে ধর্ম্ম আচরণ ও প্রচার করেছিলেন তার মধ্যে কোন রকম দুর্ব্বলতার স্থান ছিল না। তাঁর বিশিষ্ট অনুচরদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা যে কোন দেশে যে কোন সময়ে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করতে পারতেন। হরিনাম-কীর্ত্তন নিষেধ করে নবদ্বীপ মুলুকের কাজী যে আদেশ দিয়েছিল শ্রীচৈতন্য তা মানেন নি। তিনি নবদ্বীপের লোকদের নিয়ে কাজীকে দমন করেছিলেন। তাঁর সেই সত্যাগ্রহ বা passive resistance নীতি ভারতবর্ষে পুনরায় অনুসৃত হতে পাঁচ শ বছরের বেশি সময় লেগেছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের যে অন্তরঙ্গ সাধনা রসধর্ম্ম তা কখনই জনসাধারণের জন্যে নয়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সেই ধর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যে দেশে নিবীর্য্যতা আসবার সুযোগ দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। "দুর্গা-বরপুত্র" গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব ছিলেন বড় যোদ্ধা। সুলতান হোসেন শাহও তাঁর রাজ্য জয় করতে পারেন নি। উপরন্তু তাঁর গর্ব্ব ছিল "শরণাগত-জবুনাপুরাধীশ্বর-হুসনশাহ সুরত্রাণ-শরণরক্ষণ" বলে। তিনি শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হয়ে পড়ায় এবং

উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মের দ্রুত প্রসার ঘট্‌ল। এর ফলে দুই পুরুষের মধ্যেই গজপতি-বংশের পতন হল। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশেও দেখি এই ব্যাপার। তবে ঝাড়িখণ্ড স্বভাবতই দুর্গম দেশ এবং লোকেরাও আদিমভাবাপন্ন। তাই এখানে স্বাধীনতা অত শীঘ্র নষ্ট হয় নি।

৬

পঞ্চদশ শতাব্দীতে গৌড়ের কাছে ভাগীরথী-তীরে রামকেলী গ্রাম ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। ভাগবতাশ্রিত ভক্তিধর্ম্মের চর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল রামকেলী। সনাতন রূপ প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা এখানে বাস করতেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভাই বিদ্যাবাচস্পতি রামকেলীতে থাকতেন। সনাতন তাঁকে গুরু বলে বন্দনা করেছেন। হোসেন শাহও বিদ্যা-বাচস্পতিকে মান্য করতেন। বিদ্যাবাচস্পতির পৌত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি তাঁর 'ভ্রমরদূত' কাব্যের শেষে পিতামহের সম্বন্ধে বলেছেন,

> যোঽভূদ্ গৌড়ক্ষিতিপতিশিখারত্নঘৃষ্টাঙ্ঘ্রিরেণু-
> র্বিদ্যাবাচস্পতিরিতি জগদ্গীতকীর্ত্তিপ্রপঞ্চঃ।

রামকেলী-নিবাসী কবি চতুর্ভুজ ১৪১৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'হরিচরিত' নামে সংস্কৃতে এক কৃষ্ণলীলাবিষয়ক মহাকাব্য লেখেন চৌদ্দ সর্গে। রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'-তে রামকেলী-নিবাসী অনেক কবির লেখা কৃষ্ণ-লীলাত্মক শ্লোক সংগৃহীত আছে। রূপ গোস্বামীর 'উদ্ধব-সন্দেশ' প্রভৃতি কয়েকটি কাব্য এইখানেই লেখা হয়েছিল।

শুধু কাব্যে নয় মূর্ত্তিশিল্পেও কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হত এই অঞ্চলে। শ্রীচৈতন্য যখন প্রথমবার বৃন্দাবন-যাত্রায় রামকেলী পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন তখন কানাই-নাটশালা গ্রামে চিত্রে অথবা স্থাপত্যশিল্পে কৃষ্ণলীলা দেখে খুশি হয়েছিলেন। কানাই-নাটশালা নামে গ্রাম অন্য স্থানেও আছে। এ সব জায়গাতেও বোধ হয় উৎসব উপলক্ষ্যে মৃন্ময়-মূর্ত্তিতে কৃষ্ণচরিত্র উপস্থাপিত হত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চল ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। যে-সব পণ্ডিত রাজসভার সংস্পর্শে আসতেন তাঁদের ঐশ্বর্য্যসম্মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেত বটে কিন্তু সাধারণ লোকে তাঁদের থেকে দূরে দূরেই থাকৃত। এইজন্যে রাজসভার আওতা হতে দূর বলে সারা বাংলাদেশ থেকে পণ্ডিত এসে নবদ্বীপে অথবা শান্তিপুরে গঙ্গাবাস তথা বিদ্যার আদান-প্রদান করতে থাকেন। এইসব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কেহ-বা ছিলেন ধনী জমিদার, কেহ-বা ছিলেন ধার্ম্মিক ধনীর আশ্রিত, আবার অনেকে ছিলেন একেবারে নিষ্কিঞ্চন। কিন্তু পাণ্ডিত্যের ও চারিত্র্যের মহিমায় ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বড় বেশি প্রভেদ ছিল না। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিস্থলে নবদ্বীপের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা বর্ণনায় বৃন্দাবন-দাস শতমুখ হয়েছেন,

নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে,
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।
ত্রিবিধ বসয়ে এক জাতি লক্ষ লক্ষ,
সরস্বতী-দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ।
সবে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে,
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপ যায়,
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়।
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়,
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়।

৭

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ম্লেচ্ছ আচার সযত্নে পরিহার করতেন বটে কিন্তু গ্রামস্থ মুসলমানদের সঙ্গে সদ্ভাব ও প্রীতির সম্পর্ক রেখে চলতেন। শ্রীচৈতন্য যখন ক্রুদ্ধ হয়ে দলবল নিয়ে কাজীর ঘরে চড়াও হয়েছিলেন তখন কাজী তাঁকে শান্ত

করবার জন্যে শ্রীচৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে তার প্রীতির সম্বন্ধ স্মরণ করিয়েছিল,

গ্রাম-সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা,
দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা,
সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।

কোন কোন বৃত্তি মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল। এদের সংস্পর্শে সকলকেই আসতে হত, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদেরও। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তন-উৎসব হত, সেই উপলক্ষ্যে শ্রীবাসের পরিজন দাসদাসী সকলেই শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহ লাভ করেছিল। শ্রীবাসের দরজীও বঞ্চিত হয় নি।

শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন,
প্রভু তারে নিজ রূপ করাইল দর্শন।

মুসলমান রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে অত্যাচারীর অসদ্ভাব ছিল না। হোসেন শাহের সিংহাসনলাভের পূর্ব্বে কয় বছর গৌড়-সিংহাসন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছিল। সেইসময়ে দেশে কিছু অশান্তি হয়েছিল। নবদ্বীপে এইসময়ে অত্যাচার কিছু বেশি রকম হয়েছিল কেননা তখন লোকের মুখে এই প্রবাদ জোর চলেছিল যে গৌড়ের সিংহাসনে ব্রাহ্মণ রাজা হবে। এইকারণেই শীঘ্রই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের অতুল প্রভাবে স্থানীয় শাসনকর্ত্তারা শঙ্কিত হয়েছিল।

কেহ বলে বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে,
সেই বুঝি এই হেন কখন না নড়ে।

শ্রীচৈতন্যের বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর অনুচর ও অনুগত ব্যক্তিদের রাজশাস্তির ভয় দেখাত কীর্ত্তন বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে।

কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ,
শ্রীবাসের তরে হৈল দেশের উচ্ছাদ।

আজি মুঞি দেয়ানে শুনিল সব কথা,
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা।
শুনিলেন নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ,
ধরি আনিবারে হৈল রাজার আদেশ।...
এইমত কথা হৈল নগরে নগরে,
রাজনৌকা আসে বৈষ্ণব ধরিবারে।

দুষ্ট রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচারের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পাই চৈতন্যভাগবতে। গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে একদা ম্লেচ্ছভয়ে সপরিবারে পালাতে হয়েছিল। সেইকথা স্মরণ করিয়ে শ্রীচৈতন্য তাঁকে বলেছিলেন ভাবাবেশে,

তোর মনে জাগে,
রাজভয়ে পলাইস যবে নিশাভাগে।
সর্ব্ব পরিকর সনে আসি খেয়াঘাটে,
কোথাও নাহিক নৌকা পড়িলি সঙ্কটে।
রাত্রি শেষ হইল তবে নৌকা না পাইয়া,
কাঁদিতে লাগিলা তুমি দুঃখিত হইয়া।
মোর অগ্রে যবনে স্পর্শিবে পরিবার,
গাঙ্গে প্রবেশিতে চিত্ত হইল তোমার।
তবে আমি নৌকা লৈয়া খেয়ারির রূপে,
গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে।
তবে নৌকা দেখি তুমি সন্তোষ হইলা,
অতিশয় প্রীত করি বলিতে লাগিলা।
আরে ভাই আমারে রাখহ এইবার,
এক তঙ্কা এক জোড় বখ্‌শিশ তোমার।

যে-সব হিন্দু ফৌজে অথবা স্থানীয় দেওয়ানে কাজ করত শিকদার বা কোটাল রূপে তারা প্রায়ই মুসলমানের শিক্ষা ও আচরণ গ্রহণ করত। নবদ্বীপের কোটাল

দুই ভাই জগাই মাধাই ব্রাহ্মণসন্তান ছিল বটে কিন্তু তাদের আচার ছিল জঘন্য। জয়ানন্দ বলেছেন, তারা "মসনবি আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।" বৃন্দাবন-দাস লিখেছেন,

দেয়ানে নাহিক দেখা বোলায় কোটাল,
মদ্যমাংস বিনা আর নাহি যায় কাল।
ছাড়িল গোষ্ঠীয়ে বড় দুর্জ্জন দেখিয়া,
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া।
এ দুই দেখিয়া সব নদীয়া ডরায়,
পাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায়।

জয়ানন্দ ভবিষ্যদ্‌বাণী বলে যা লিখেছেন তা তখনকার অনেক হিন্দুসন্তানের সত্যপরিচয়,

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে,
মোজা পাএ নড়ি হাথে কামান ধরিবে।
মসনবি আবৃত্তি করিবে কোন জন,...

ক্বচিৎ উচ্চবর্ণের কোন হিন্দু লাভলোভবশে অথবা স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করত। তাতে বড় কেউ বাধা দিত না। বৃন্দাবন-দাসের কথায় সেকালের সমাজের ঔদাসীন্যের পরিচয় পাচ্ছি,

হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ,
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম্ম,
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম।

মুসলমানদের মনোভাব ছিল বিপরীত। মুসলমানের পক্ষে হিন্দুয়ানি আচার তাদের অসহ্য ছিল, কারণ তাতে শাসকজাতির মর্য্যাদাহানি হয়। হরিদাসকে মুলুক-পতি অকথ্য নির্য্যাতন করেছিল কাজীর এই নালিস শুনে,

যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার,
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার।

ব্রাহ্মণেরা যেমন নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাত বলে মনে করত, সেই দেখাদেখি মুসলমানেরাও নিজেদের "মহাবংশজাত" মনে করত। হিন্দুরা যেমন মুসলমান সম্পর্কে ছুঁত-বিচার করে, তখন মুসলমানরাও তেমনি করত। হরিদাসকে মুলুক-পতি এই বলে বোঝাতে চেয়েছিল,

আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত,
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশজাত।

হিন্দুর পক্ষে চরম শাস্তি ছিল জাতিনাশ। অধিকাংশস্থলে অমেধ্য ভক্ষ্য বা পানীয় খাইয়ে হিন্দুর জাতিনাশ করা হত। যাদের মনের জোর বেশি ছিল তারা হয় ভৃগুপাত নয় অন্য উপায়ে দেহত্যাগ করত কিংবা গৃহত্যাগ করত। অন্যেরা অগত্যা যবনাচার গ্রহণ করত। চৈতন্যচরিতামৃতে সুবুদ্ধি রায়ের সম্বন্ধে এবিষয়ের একটি পুরানো ঐতিহাসিক চিত্র পাই। সুবুদ্ধি রায় ছিলেন "গৌড়-অধিকারী" অর্থাৎ গৌড় শহরের চৌধুরী বা কোতোয়াল। তাঁর এক কর্ম্মচারী ছিল সৈয়দ হোসেন খাঁ। সুবুদ্ধি রায় এক দীঘি কাটাচ্ছিলেন। সে-কাজের তদারকের ভার ছিল হোসেন খাঁর উপর। হোসেন খাঁর গাফিলতিতে বিরক্ত হয়ে সুবুদ্ধি রায় তাকে একদিন চাবুক মেরেছিলেন। পরে এই সৈয়দ হোসেন খাঁ গৌড়-সিংহাসন অধিকার করে হোসেন শাহ নামে খ্যাত হন। পূর্ব্বের মনিব বলে সুবুদ্ধি রায়কে তিনি খুব খাতির করতে থাকেন। মনে হয় তাঁর রাজ্যলাভে সুবুদ্ধি রায়ের কিছু হাত ছিল। একদিন বেগম সুলতানের অঙ্গে চাবুক মারার শুষ্ক ক্ষতচিহ্ন দেখে সব কথা জেনে নেয় ও সুবুদ্ধি রায়কে হত্যা করবার জন্যে জেদ করতে থাকে। হোসেন শাহ বিজ্ঞ, তিনি জান্‌তেন যে সুবুদ্ধি রায় তাঁকে প্রাপ্য শাস্তিই দিয়েছিলেন, তাই তিনি সুবুদ্ধি রায়কে হত্যা করতে কিছুতে রাজি হলেন না।

রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা,
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা।

স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে,
রাজা কহে জাতি নিলে ইহোঁ নাহি জীবে।

স্ত্রীর নির্বন্ধে পড়ে শেষে সুলতান "করোয়ার পানী তার মুখে দেওয়াইলা"। সুবুদ্ধি রায় সংসার ছেড়ে কাশী চলে গেলেন। সেখানে পণ্ডিতদের কাছে ব্যবস্থা চাইলে কেউ বললেন, "তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণ"; অপরে বললেন, "এই নহে, অল্পদোষ হয়"। স্মার্ত্তপণ্ডিতদের মতানৈক্যে সুবুদ্ধি রায়ের চিত্ত সংশয়িত হয়ে রইল। তারপর শ্রীচৈতন্য যখন বারাণসীতে এলেন তখন তাঁর কথামত সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। তিনি বনে বনে ঘুরে শুখনা কাঠ কুড়িয়ে বোঝা বেঁধে মথুরায় এনে বেচতেন পাঁচ-ছয় পয়সায়। এক পয়সায় তিনি "চানা চাবানা" খেতেন, আর বাকি পয়সা বেনের দোকানে গচ্ছিত রাখতেন। সেই সঞ্চিত পয়সায় তিনি

দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন,
গৌড়িয়া আইলে দধিভাত তৈলমর্দ্দন।

৮

ব্রাহ্মণপণ্ডিত অনেকেই ছিলেন সুদরিদ্র। সেজন্য তাঁদের মনে খুব ক্ষোভ ছিল না। তাঁদের ব্রাহ্মণ্যগর্ব্ব ছিল ব্রত-উপবাসের কঠোরতায়। বড় ব্রাহ্মণ সে যে পরপর ছয় রাত্রি উপবাস করতে পারত। কৃত্তিবাস তাই বলেছেন, "ভাই মৃত্যুঞ্জয় ষড়রাত্রি উপবসে"। আধ্যাত্মিক আদর্শের চরম পরিণতি ছিল সন্ন্যাসগ্রহণে।

ঐশ্বর্য্যবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ভোগসুখের এক উজ্জ্বল ছবি এঁকেছেন বৃন্দাবন-দাস। চাটিগ্রামের পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে এসে থাকতেন। এঁর অন্তরের ভক্তিরসমাধুর্য্য ছিল বাইরের আড়ম্বর-ঐশ্বর্য্যে ঢাকা। মুকুন্দ দত্তের সঙ্গে গদাধরপণ্ডিত একদিন পুণ্ডরীকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তাঁর বিষ্ণুভক্তির প্রশংসা শুনে এবং শ্রীচৈতন্যের কাছে তাঁর খাতির দেখে। গিয়া দেখেন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বার দিয়ে বসেছেন রাজপুত্রের মত।

দিব্যখট্টা হিঙ্গুলে পিত্তলে শোভা করে,
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে।
তহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মবাসে,
পট্টনেত বালিস[১] শোভয়ে চারিপাশে।
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত,
দিব্য পিতলের বাটা পাকা পান[২] তাত।
দিব্য আলবাটী[৩] দুই শোভে দুই পাশে,
পান খায় গদাধর দেখি দেখি হাসে।
দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুইজনে,
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে।
চন্দনের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক কপালে,
গন্ধের সহিত তথি ফাগুবিন্দু মিলে।
কি কহিব সে বা কেশভারের সংস্কার,
দিব্যগন্ধ আমলক বহি নাহি আর।...
সমুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবানা[৪],
বিষয়ীর প্রায় যেন সকল শোভনা।

সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য উজ্জ্বল করে তুললেন শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনুচরগণ। এজন্যে প্রথম প্রথম তাঁদের অনেক উপহাস সহ্য করতে হয়েছিল,

কৃষ্ণভক্তি তোমার হইল কোন সুখ,
মাগিয়া সে খাও আরো বাড়ে যত দুঃখ।

পরবর্ত্তী কালে নবদ্বীপের ন্যায়বিশারদ পণ্ডিতদের মধ্যে যে দারিদ্র্যগর্ব্ব দেখা গিয়েছিল তার সূত্রপাত করে যান শ্রীচৈতন্য।

---

[১] সূক্ষ্ম রেশমি কাপড়ের বালিস। [২] ছাঁচি পান। [৩] পিকদানী। [৪] চাঁদোয়া দেওয়া।

নিষ্কিঞ্চনতার নিষ্কলুষ আবহাওয়াতেই ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলে নব্যন্যায়ের ও স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। মোগল-শাসন দৃঢ়বদ্ধ হবার পর থেকে প্রান্তীয় রাজন্যবর্গের ও স্থানীয় ভূস্বামীদের প্রভাব, প্রতিপত্তি কমে আসে। সেইজন্যে সংস্কৃতবিদ্যা ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে গঙ্গাতীর ধরে প্রসারিত হতে থাকে। অবশ্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যে বড় পণ্ডিত একবারে ছিল না এমন নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রূপরাম চক্রবর্ত্তী তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন যে তাঁর গুরু তাঁকে বলেছিলেন পাঠ সাঙ্গ করবার জন্যে নবদ্বীপে অথবা শান্তিপুরে কিংবা জৌগ্রামে যেতে,

> বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে আছে,
> ভারতী পড়িতে বেটা চল তার কাছে।
> নহে জউগ্রাম চল কলানিধির ঠাঞি,
> তাঁর সম ভট্টাচার্য্য শান্তিপুরে নাঞি ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সংস্কৃতবিদ্যার অনুশীলন প্রধানত নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১২২৫ সালে বৈষ্ণবমতের স্বকীয়-পরকীয়বাদ নিয়ে এক বিরাট বিচারসভা হয়েছিল। তাতে স্বকীয়বাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন জয়পুরের মহারাজার সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য, আর পরকীয়বাদের মুখ্যপাত্র ছিলেন রাধামোহন ঠাকুর। পক্ষ-প্রতিপক্ষ-সাক্ষীদের মধ্যে নবদ্বীপ-শান্তিপুর ছাড়া অন্য অনেক স্থানেরও পণ্ডিতদের নাম পাই। যেমন, দিনাজপুরের শ্রীধর বিদ্যাবাগীশ, বিক্রমপুর-সোনারগ্রামের ব্রহ্মানন্দ দেবশর্ম্মা, বাহাদুরপুরের সাহেবপঞ্চানন দেবশর্ম্মা, নাসিগ্রামের নারায়ণ দেবশর্ম্মা, বাব্‌লার কৃষ্ণকিশোর দেবশর্ম্মা ইত্যাদি। সাক্ষীদের মধ্যে কায়স্থের এবং মুসলমানেরও নাম আছে।

৯

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের হিন্দু-রাজসভায় প্রাচীনকালের রীতিনীতি ও পদবী যথাসম্ভব অনুসৃত হয়ে এসেছিল। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিতে। ধর্ম্ম-ঠাকুরের ছড়ায়-গানে অনেক কিছু প্রাচীন

বস্তু লুকানো রয়েছে। পূজার অনুষ্ঠানের মধ্যেও প্রাচীন প্রথার ধারাবাহিকতা দেখতে পাই। ধর্ম্ম-ঠাকুরের গাজনে তাঁর যে-সব পরিচারকের উল্লেখ আছে তার মধ্যে হিন্দুযুগের রাজসভায় পদিকের উপাধি পাচ্ছি। যেমন, কোঙরসাঞি (< কুমারস্বামী), যুবরাজ, উঠাসিনী (< ঔত্থায়াসনিক), ধামাৎকর্ণি (<ধর্ম্মাধিকরণিক), আমিনি (<আম্নায়িক), শান্তিবিগ্রহী (<সান্ধিবিগ্রহিক), পড়িহার বা পড়্যার (<প্রতীহার), মহাপাত্র, সাঙ্গই (<সজ্ঘপতি), মহাসাঙ্গই (<মহাসজ্ঘপতি), ঘুড়াইত (< ঘোটকপতি), পাহুড়সাঙ্গই (<প্রাঘুটকসজ্ঘপতি), দণ্ডসাঙ্গই (<দণ্ডসজ্ঘপতি), চঙরলেয়োগী (<চামরনিয়োগী), ভাণ্ডারলেয়োগী (<ভাণ্ডারনিয়োগী), বাসহরি (<বাসগৃহক, অর্থাৎ শয়নপাল), ভোগাধিকারী, ইত্যাদি। এইসব পদিকেরা ছিল প্রধানত রাজার বিশ্বস্ত পারিষদ এবং শরীররক্ষী।

বিষ্ণুপুরের মল্ল-রাজাদের প্রধান মহিষীর উপাধি ছিল "শ্রীশ্রীচূড়ামণি পট্টমহাদেবী", আর যুবরাজপত্নীর উপাধি ছিল "শ্রীশ্রীধ্বজামণি পট্টমহাদেবী"। মল্ল-রাজাদের বহু পদিকের উপাধি এখন দক্ষিণরাঢ়ের অনেক জাতের পদবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, শাশমল (< সাহসমল্ল বা সহস্রমল্ল), বাহুবলীন্দ্র, গাঁথাইত (<গ্রন্থাধিকৃত) ইত্যাদি।

রাজস্বব্যাপারে যে কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত হত তাদের মধ্যে প্রাচীন ও নবীন দুরকমের পদবী প্রচলিত ছিল। প্রাচীন পদবী যেমন নিয়োগী, চৌধুরী (তুলনীয় মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের উক্তি, "নিয়োগী চৌধুরী নহি না করি তালুক"), দেশমুখ, মল্লিক ইত্যাদি। নবীন পদবী যেমন, শিকদার, ডিহিদার, মজুমদার, বখশী প্রভৃতি।

ষোড়শ শতাব্দীরও আগে থেকে হিন্দুরাজারা ও সেনাপতিরা দরবারে পশ্চিমী পোষাক পরতেন। যুদ্ধকালেও পাগড়ি-ইজার-কাবাই পরা হত। রণোন্মত লাউসেনের বর্ণনায় রূপরাম লিখেছেন,

> পরিল ইজার খাসা নাম মেঘমালা,
> কাবাই পরিল দশদিগ করে আলা।
> পামরি পটুকা দিয়া বান্ধে কোমরবন্ধ,…

৩০

শ্চমবঙ্গে নৌবাহিনীর তেমন প্রয়োজন বা অবকাশ না থাকায় দণ্ডশক্তি
ারণত ছিল চতুরঙ্গ নয়, ত্রি-অঙ্গ—পদাতি, অশ্ব ও গজ। অস্ত্রশস্ত্র ছিল
-খাঁড়া, বর্শা-বল্লম, তীর-ধনুক, গুলতাই-বাঁটুল, লাঠি-সড়কি ও বন্দুক-কামান।
মেসে অর্থাৎ বাঁধা "জুঝার" নিযুক্ত করা হত এই সব জাতি থেকে—পড়্যার
প্রতীহার), আগরি (<অগ্রহারিক), গোয়ালা, তেঁতুলিয়া ও কুশমাট্যা
, লোহার, চোয়াড়, পাটন, ডোম ও হাড়ি। দরকার হলে ভাড়াটে সেনাও
করা হত। এদের মধ্যে প্রধান ছিল মুসলমান, চৌহান (রাজপুত),
য়া, তৈলঙ্গি, ও পরে ফিরাঙ্গি। দরকার পড়লে সকলকেই যুদ্ধে নামতে
, বিশেষ করে যারা রাজপরিষদ ছিল বা রাজদত্ত ভূমি ভোগ করত।
ণ-পুরোহিতও বাদ যেতেন না। সুস্থ ও স্বাধীন জাতির নিয়মই তাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা রূপরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে সেকালের
াজ-মিছিলের একটি বাস্তবগর্ভ উজ্জ্বল বর্ণনা আছে। এখানে তা সংক্ষেপে
ছি।

রাজার হুকুম নিয়ে মহাপাত্র পূর্ণ সমরসজ্জা করে চলেছে গৌড় থেকে দক্ষিণ-
ঢ়ের প্রান্তভাগে, দক্ষিণময়না জয় করে লাউসেনকে জব্দ করতে,—সম্ভবত যেমন
র চলেছিল হোসেন শাহ গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে। দামামায় যুদ্ধ-
ার সঙ্কেত-ধ্বনি বেজে উঠল, রাজ্যময় সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। বার-
ঞা, বাহাত্তর-মণ্ডল, দেশমুখ সবাই সাজল। রাজার দলবল সাজল।
লমান জাগীরদার ও সর্দ্দার সকলে সেজে এল।

হাসন হুসেন সাজে পায়ে দিয়া মোজা,
যাহার সঙ্গতি সাজে বাইশ হাজার খোজা।
ঘোড়ার পিঠে পান পানি হেড়া আর রুটি,
চলিতে তুরঙ্গ পায়ে বাজে তুলাগুটি।

ভুরুকুণ্ডার পাঠান, রাউটির মোগল—সবাই এল ছুটে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র পুরানো, তবে একতা অসাধারণ।

কাল ধল রাঙ্গা টুপি সভাকার মাথে,
রামের ধনুক-শর সবাকার হাথে।
সকল বচনে তারা সঙরে খোদায়,
এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায়।

তারপর এল পশ্চিমদিকের থানাদার খানসামা-কাজী সাত হাজার সওয়ার নিয়ে। তারা

বিশাশয় কামানে সাজে বড় বড় গোলা,
দাম দুম শব্দ শুনি চঞ্চল অচলা।

তার পর

সর্দ্দার-সিফাই সাজে বাহাদুর খাঁ,
গৌড়ে ইনাম যার বিশাশয় গাঁ।
সাজিল হাথির পিঠে বঙ্গ-মিঞা কাজী,
কর্ণের সমান দাতা রণে মর্দ্দ গাজী।

তার পাছু পাছু এল সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বর্দ্ধমানের রাজা কালিদাস, মঙ্গল-কোটের রাজা রঘুপতি, ধলভূমের রাজা, মল্ল-রাজা, ভালকির "ভবানী মহাশয়", বায়ড়ার পড়্যার রাজীব রায়। তার পরে

বিনোদ ঘোষাল সাজে রাজপুরোহিত,
দলে-বলে দড় বড় বিচারে পণ্ডিত।

তার পর এল চার হাজার চৌহান সিপাই নিয়ে রাম রায়, বিয়াল্লিশ কাহন তীরন্দাজ নিয়ে "গৌড়ের দিগার" দক্ষিণ রায়, সাত হাজার ঘোড়া নিয়ে "রাজ্যের

ঠাকুর" কুঞ্জর সিংহ। তার পিছনে দশ হাজার রানা নিয়ে ভবানীর "বার বেটা তের নাতি আঠার ভাগিনা"। তার পর

সাজিল আগরি ভূঞা দক্ষিণ হাজরা,
আট হাজার ঢালি সঙ্গে যেন খসে তারা।

তার পর

ভগীরথ সিংহ সাজে ভূপতির মামা,
যাহার নস্করে বাজে বিশাশয় দামা।

তারপর ধেয়ে এল দুর্দ্ধর্ষ তেঁতুল্যা বাগদি গজপতি, যে "আপ্ত-বলে হানা দেই নাই মানে বিধি।" তার

সর্ব্বকাল বাঁশে বান্ধা হাঁড়িয়া চামর,
হাথে বালা কানে সোনা দেখিতে সুন্দর।

তার পর এল কুসমাট্যা বাগদি ঢালি-পাইক আর গোয়ালা "ধানুকি"। তার পর

পাঞ্জা পাইক সাজিল কোমরে ঘাঘর,
গলায় ওড়ের মালা হাথে ধনুশর।
লোহার নবাজ সব চোয়াড় পাটন,
হাঁকে হাথি পাছাড়ে হাথ্যার বিচক্ষণ।

তার পরে পঞ্চাশ হাজার ডোম নিয়ে

কামদেব প্রহরী সাজে কালু-বীরের ভাই,
গৌড়ে নাহিক মানে রাজার দোহাই।
কাড়া বাজে ডিগ-ডিগ টিঙ্গ-টিঙ্গ পড়া,
হাড়ি পাইক সাজিল সর্দ্দার লোহার-গড়া।
পায়ে বাজে নপুর ঘাঘর বাজে ঢালে,
ঘুরুল্যা বাতাস পারা ঘুর্য়া ঘুর্য়া বুলে।

নিয়লি সিয়লি সাজে মাল পাইক খড়ি,
পুণ্যের প্রতাপে চড়ে পক্ষরাজ ঘুড়ি।

তার পরে সাজল "খানেজাদ ভাইয়া" সুরথ সিংহ, আর মাজিয়ার রানা সাত ভাই। তাদের

যমের সমান সঙ্গে তিন লক্ষ ঢালি,
টেড়ি কর‍্যা পাগ বান্ধে রাঙ্গামুটা বালি।

তার পর এল জগৎ মল্লিক—"সংসারে সিফাই নাঞি তাহার তুলনা"—

আশী হাজার ঢালি সঙ্গে আগু পড়ে খানা,
রাজার হুকুম আছে আগে দেই হানা।

তার পর

হরি দলই সভার আগে হাড়ি পাইক সাথে,
হাথিকে হাথ্যার হানে ঢাল-খড়্গ হাথে।
তার পাছে মোদক সাজে গোসাঞিদাস পাঞা,
চৌদিকে ফলঙ্গ দেই ফিরাইয়া নেঞা।
কামানি কামান সাজে সিলিদার সিলি,
রাম কৃষ্ণ মনে করে রঙ্কিণী বাসুলী

তার পর সাজল ইন্দু মিঞা খোন্দকার। তার পিছনে

রানা পাইক দেখা দিলে রক্ষা আছে কার।
রক্তবর্ণ ধূলা মাথে রহনি খেলায়,
অস্ত্রবান্ধা-পরিপূর্ণ উড়্যা যাত্যে চায়।

তার পর এল "লোহার ধনুক হাথে" আট কাহন মাঝি পাইক। তার পর

ফিরাঙ্গি সভার আগে পক্ষরাজ ঘোড়া,
শোভা করে হাথ্যার স্বর্ণ জামাজোড়া।
তেলঙ্গা ধানুকি সাজে বত্তিশ কাহন,
উড়্যা পাইক ঐমনি উড়িতে করে মন।

কপালে সিন্দুর-ফোটা গলে ওড়-মালা,
মনে জপে ভদ্রকালী ভবানী বিশালা।

শেষে এল অসংখ্য ভূঞ্যা কোল জয়ঢোল বাজাতে বাজাতে। তাদের

চিকুরে চিরনি আছে অঙ্গে রাঙ্গামাটি,
জাত্যের স্বভাবে তীর ধরে দিবারাতি।

১১

এখনকার দিনে হিন্দুদের পূজিত অধিকাংশ দেবদেবী পঞ্চদশ শতাব্দী শেষ হবার পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। তান্ত্রিক সহজমতের দেবদেবীর পূজা এইসময়েই ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিগ্রন্থে স্বীকৃতি লাভ করে। সমাজের নিম্নতর স্তর থেকে উঠেছিলেন বিষহরি (< বিষধরিকা) বা মনসাদেবী। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে বিষহরি-পূজার বাহুল্য বৃন্দাবন-দাস উল্লেখ করে গেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিপ্রদাস পিপিলাই-এর মনসামঙ্গল কাব্য লেখা হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে পশ্চিমদক্ষিণ-বঙ্গের গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণ তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে বর্ষকৃত্যের মধ্যে মনসাপূজার বিবরণ দিয়েছেন।

দুর্গার বা চণ্ডীর পূজা ভারতে অনেককাল থেকেই চলে এসেছে। হলায়ুধ তাঁর 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব'-এ নিত্যকৃত্যের মধ্যে বৈদিকমন্ত্রে চণ্ডীপূজার উল্লেখ করেছেন। বাসন্ত এবং শারদীয় দুর্গোৎসবও প্রাচীন উৎসব। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আগে থেকে শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালীর প্রধান সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছিল। দুর্গা-প্রতিমা চতুর্ভুজা, দশভুজা কিংবা অষ্টভুজা হত। তখনকার দিনের স্বচ্ছল গৃহস্থ-মাত্রেই দুর্গোৎসব করত। বৃন্দাবন-দাস বলেছেন,

মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্ব-ঘরে,
দুর্গোৎসব-কালে বাদ্য বাজাবার তরে।

ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজার কথা অন্যত্র বলেছি। তান্ত্রিকমতে বাসুলী, চণ্ডিকা, ক্ষেত্র-পাল প্রভৃতি গ্রাম্য-দেবদেবীর পূজা হত। এমন কি শাখোটবাসিনী বনদুর্গারও।

চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি-কাহিনীর মঙ্গলচণ্ডীও এইরূপ বনদুর্গা। কালকেতু-কাহিনীর দেবী পৌরাণিক গোধিকাবাহনা চণ্ডী। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে খোদাই করা গোধিকাবাহনা দেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি অনেক পাওয়া গেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল-গান বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। লোকে টাকা খরচ করে দূর দেশ থেকে ভাল গায়ন আনত। শ্রীবাসের বাড়িতে শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তন দূর থেকে শুনে জগাই মাধাই বলেছিল,

নিমাই পণ্ডিত
করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত।
গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাঙ,
সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাঙ।

ব্রাহ্মণসমাজে তান্ত্রিক গুহ্য উপাসনাও অজানা ছিল না। বৃন্দাবন-দাসের বর্ণনায় তান্ত্রিকচক্রের উপাসকেরা

রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে,
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে।
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ।

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের প্রভাবে শক্তি-উপাসনাতেও অচিরে ভক্তিরসের সঞ্চার হল। তান্ত্রিকতা লুপ্ত হল না বটে কিন্তু তার বিষদাঁত গেল ভেঙে, অর্থাৎ উপাস্য-উপাসকের সম্পর্কে ভয়-ভক্তির স্থানে বাৎসল্য-প্রীতির হৃদয়সম্পর্ক স্থাপিত হল। চৈতন্যবন্দনা দেবীমঙ্গলকাব্যের উপক্রমে স্থান লাভ করল। যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু সম্পূর্ণ করলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রীনিবাসের অনুগৃহীত "মল্লাবনীনাথ" বীর-হাম্বীর ও তাঁর বংশধরগণ। মল্ল রাজারা তাঁদের অধিকারভূমিতে বৈষ্ণব-আচার করলেন কঠোরভাবে আবশ্যিক। দেশের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলেও এর অনুকরণ হতে দেরি হয় নি। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই

"বাধ্যতামূলক" বৈষ্ণবতার প্রভাব কিরূপ হাস্যকর হয়েছিল তার একটু উদাহরণ রূপরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল থেকে দিচ্ছি,

রাজ্যের সহিত রাজা করে একাদশী,
পঞ্চবর্ণ দ্বিজ আদি থাকে উপবাসী।
চারা মানা হাথিকে ঘোড়াকে মানা ঘাস,
দশমীর বাদ্য বাজে রাজার নিবাস।

একাদশীর দিনে কি তবে বিষ্ণুপুরের পোষা জন্তুদেরও খাদ্য দেওয়া হত না? "গোপালসিংহের বেগার" প্রবাদের মধ্যেও অনুরূপ উৎকটতার ইঙ্গিত রয়েছে।

বিষ্ণুর শিলামূর্ত্তির ও দশাবতারের পূজা পূর্ব্ব থেকে চলে এসেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মাধবেন্দ্র-পুরী ও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা গোপালমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত হয়। তার পর ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা রাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্ত্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। গৌর-নিতাই মূর্ত্তির পূজা চলিত করেন এইসময়েই শ্রীখণ্ডের নরহরি-সরকার ঠাকুর এবং আম্বুয়া-কালনার গৌরীদাস পণ্ডিত। এই পূজার প্রথম ব্যবস্থাপক অদ্বৈত আচার্য্য।

পশ্চিমবঙ্গে সুপ্রাচীন গ্রাম্য পীঠস্থানগুলির মাহাত্ম্য কখনও খর্ব্ব হয় নি। সপ্তদশ শতাব্দীর ও পরবর্ত্তী কালের মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি পাঁচালী-কাব্যের গায়কেরা এই সব বিখ্যাত গ্রাম-দেবদেবীর বন্দনা না করে আসর জমাতেন না। ধর্ম্মমঙ্গলের কবিরাও তাঁদের কাব্যে এঁদের উদ্দেশে নতি জানিয়েছেন। সেকালের পশ্চিমবঙ্গের ধর্ম্মজীবনের অনেকটুকু ইতিহাস লুকিয়ে আছে এর পিছনে। প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের দিগ্‌বন্দনা থেকে এই সব গ্রাম্যপীঠের অল্প কিছু পরিচয় দিই। এই বর্ণনায় দক্ষিণ সীমান্ত নীলাচলের জগন্নাথ ও পশ্চিম সীমান্ত ঝাড়িখণ্ডের বা আড়ুরের বৈদ্যনাথ এখনকার কৃত্রিম বাংলাদেশের অন্তর্গত নয়।

কবি প্রথমে বন্দনা করেছেন জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার। তাঁদের

বায়ে উড়ে দেউলে শতেক হাত নেত,
পোঁড়া সব গুণ গায় হাতে করি বেত।

তার পর ধর্ম্ম-ঠাকুরের অন্যতম প্রধান পীঠ (কনারক ?),

জাজপুরের দেহারা বন্দিব এক মন
যেইখানে অবতার হইল যবন।

তার পর বর্দ্ধমান অঞ্চলে, "কাস্তাড়ার বন্দো ধর্ম্ম বল্লুকার তীরে" ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পর

বন্দিব দক্ষিণরায় প্রণিপাত হয়্যা,
দরিয়া উপরে বুলে মশিলে চাপিয়া।
কালুরায় জাড়গ্রামের বন্দিব জোড় করে,
ব্রহ্ম-অবতার বন্দো শুঁড়িদের ঘরে।

তার পর মঙ্গলকোটের জয়চণ্ডী, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, শেহাখালার বাসুলী, লাউ-গ্রামের দণ্ডেশ্বরী ("মল্লবংশ রাজা হৈল যাহার কৃপায়"), গোতানের বিশালাক্ষী, নেওড়ের নালু, গবপুরের কাঁকড়াবিছা ধর্ম্মরাজ, পাত্রসায়েরের কালঞ্জররায় ইত্যাদি। তার পর

ষষ্ঠী বুড়ি বন্দিব নিবাস তালপুর,
যার সেবা করেছিল জয়ন্তি অসুর।
প্রণাম করিয়া বন্দো পুড়াসের ঘাটু,
জামা জোড়া পরিধান আরোহণ টাটু।
হিড়িমার চণ্ডী বন্দো জামদার মহামাই,
কালুরায় দক্ষিণরায় বন্দো দুই ভাই।

কালুরায় জলদেবতা, কুম্ভীরবাহন—"বন্দিব দরিয়ার পীর নাম কালুরায়"। দক্ষিণরায় অরণ্যদেবতা, শার্দ্দূলবাহন। দক্ষিণবঙ্গে এখনো এই দুই দেবতার পূজা

চলিত আছে। দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য 'রায়মঙ্গল' কাব্যে গীত হয়েছে। কালুরায় মুসলমানদের ভাগে পড়ে পীর হয়েছেন বলে তাঁকে 'মসন্দলীর গীত', 'গাজির গান' ইত্যাদি ছড়া নিয়েই খুশি থাকতে হয়েছে।

প্রাচীন পাঠান-সেনাপতিরা যুদ্ধে মারা পড়লে গাজি-পীর রূপে পূজা পেতেন। মুসলমান সাধুরা তো সম্মান পেতেনই। ক্রমশ এইসব পীরস্থানের মাহাত্ম্য সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে স্বীকৃত হল। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পীরের ও পীরস্থানের উল্লেখ পাই ধর্ম্মমঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের দিগ্‌-বন্দনায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে সীতারাম-দাস যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃত করছি।

বন্দো পীর ইসমালি [১] গড় মান্দারনে।
বাঘ মহিষ কাননে বাস পালে পাল,
মান্দারন-গৌড়েতে যাহার জাঙ্গাল।[২]
গড় মাঝে বনাল্য আঠার গণ্ডা কোট,
তাহার চরণ বন্দো ভূমে হয়্যা লোট।
দারাবেগ ফকীর বন্দিব নিগাঞে,
জোড়হাথে বন্দিব পাঁড়ুয়ার সূফী[৩] থাঞে।
বড় পঁতরায়[৪] বন্দ পীর কুতুব আলম,
তাহার দরগা দিয়া নাহি চলে যম।
রাইপুরের গোরাচান্দ নানপুরে নাল,
বন্দিব সাহেব-ডুল্লা শিরে বান্ধ্যা শাল।

---

[১] অর্থাৎ ইসমাইল।

[২] অন্যত্র

পীরিসমালী সওরিয়া পথে চল্যা যায়,
মৈষে নাহি মারে তারে বাঘে নাহি খায়।

[৩] পাঠ "শুভি"।

[৪] সম্ভবতঃ "বড় পাঁড়ুয়ায়" এইরূপ পাঠ হইবে।

সংহতি বম্বানি বন্দো ভালকির পীর,
বদর আলম বন্দো সাগরে জাহীর।
ত্রিপিনির পীর বন্দো দফর খাঁ গাজি,
হুগলির হিঙ্গা বন্দো দিল হয়্যা রাজি।
কোটশিমুলের পীর বন্দো হয়্যা সাবধান,
নদীর গায়ে বসিয়া তুনিয়া পানে চান।
বন্দিব............করি কৃতাঞ্জলি,
হিজলির বন্দিব তাজখাঁ মছন্দলি।
পেকাম্বর মোকাম করিল যার হেটে,
ফর্জন্দ পয়দা লৈল কেউটালের পেটে।
নাম তার তাজখাঁ থুইল পেকাম্বর,
অধিকার দিল তারে দরিয়া ডফর।
জমি হেতু দরিয়াকে হুকুম করিল,
দশ যোজন দরিয়া হুকুমে পাছু হৈল।
পাতশাই পুত্রেরে দিয়া গেল পেকাম্বর,
বিরাম শক্করা[১] বন্দো বর্দ্ধমান ভিতর।
পেকাম্বর মদার আউল্যা শাহাজির,
নতিমান হইয়া বন্দিব সত্যপীর।

উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গেই এইরূপ পীরস্থানের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, আর সেইজন্যে এই দুই অঞ্চলেই সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ-ঠাকুরের উদ্ভব হয়।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী লেখা হতে থাকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে। কিন্তু তার আগে এর পূর্ব্বাভাস পাই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের কবিরা সকলেই আত্মপরিচয় দিয়েছেন এবং তাতে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে ধর্ম্ম-ঠাকুরের

১ বহরাম সক্কা।

প্রত্যক্ষ অনুগ্রহই তাঁদিকে কাব্যরচনার প্রেরণা দিয়েছে। তাঁদের কাছে ধর্ম্ম-ঠাকুর অনেক সময় আবির্ভূত হতেন ব্রাহ্মণ-ফকীরের বেশে। রূপরাম লিখেছেন,

পাঠ পড়্যা ঘরে আসি তৃষ্ণায় বিকল,
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম্ম হাতে দিলা ফুল।
একে শনিবার তায় ঠিক দুপুর বেলা,
সম্মুখে দাড়াইল ধর্ম্ম গলে চন্দ্রমালা।
গলায় চাঁপার মালা আসা-বাড়ি হাথে,
ব্রাহ্মণের রূপে ধর্ম্ম দাণ্ডাইল পথে।

উত্তরবঙ্গে সত্যপীরের উদ্ভব হয়েছিল পৃথক্‌ভাবে। এখানে সত্যপীরের কাহিনী সম্পূর্ণভাবে কবিকল্পিত নয়। মহীপুর-গ্রামনিবাসী কৃষ্ণহরি দাসের সুবৃহৎ সত্যপীর-পাঁচালীতে যে বিস্তৃত কাহিনী পাই তার মূলে ঐতিহাসিক ঘটনা থাকা অসম্ভব নয়। কৃষ্ণহরির মতে সত্যপীর ছিলেন মালঞ্চার রাজকন্যা সন্ধ্যাবতীর কানীন পুত্র। পাহাড়পুরের বিরাট মন্দির ধ্বংসের সঙ্গে এই কাহিনী মৌলিক যোগ থাকাও বিচিত্র নয়।

১২

ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রের চর্চ্চা ছিল ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া। তবে ব্যাকরণ কাব্য পুরাণ প্রভৃতির চর্চ্চা অন্যজাতির লোকেও করত। ধর্ম্মঠাকুরের পূজারী নীচ জাতি হলেও শাস্ত্র-চর্চ্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত হত না। মুসলমান পণ্ডিতেরাও যে কাব্য-নাটক, অলঙ্কার-ছন্দঃ, সঙ্গীতশাস্ত্র ও নাট্যশাস্ত্র, লিখতেন তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাচ্ছি কবি আলাওল। দক্ষিণরাঢ়ে স্থানে স্থানে এখনও ডোম ও বাগদী পণ্ডিতের টোল আছে। সেখানে ব্যাকরণ-কাব্য ইত্যাদির পঠন-পাঠন হয় এবং বামুনের ছেলেরাও পড়ে।

উচ্চবর্ণের মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার কিরকম চলন ছিল তা জানা যায় না। তবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে বৈষ্ণব-আচার্য্যবাড়ির মেয়েরা অনেকেই

ভালরকম শিক্ষা পেতেন। নিত্যানন্দ-প্রভুর পুত্রবধূ, বীরচন্দ্র গোস্বামীর পত্নী সুভদ্রাদেবী সংস্কৃতে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন,—শাশুড়ী জাহ্নবাদেবীর প্রশস্তি 'অনঙ্গকদম্বাবলী'। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতাদেবী বৈষ্ণব-পদ রচনা করেছিলেন। এইখানে একটা কথা বলে রাখি। অনেকে বলেন, দুঃখিনী নামে এক বৈষ্ণব-পদরচয়িত্রী ছিলেন। একথা নিতান্ত ভুল। "দুঃখিনী"-র আসল নাম শ্যামানন্দ।

সাধারণ পূজারী ব্রাহ্মণের শিক্ষার দৌড় ছিল ব্যাকরণ, কাব্য, ছন্দ, অলঙ্কার, স্মৃতি ও পুরাণ পর্য্যন্ত। ন্যায়শাস্ত্রও অনেকে একটু আধটু ছুঁয়ে রাখত সমাজে সম্মান পাবার জন্যে। সপ্তদশ শতাব্দীতে সাধারণ বামুনের ছেলের পাঠ্যতালিকা পাই রূপরাম চক্রবর্ত্তীর আত্মকাহিনীতে। রূপরাম পাসণ্ডার ভট্টাচার্য্যদের চৌপাড়িতে পড়তেন। সেখানে

রঘুরাম ভট্টাচার্য্য কবিচন্দ্রের পো,
খুঙ্গি পুথি দেখিয়া জন্মিল মায়া মো।
বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে,
অমর[১] জুমর[২] ভেদ হইল অল্পদিনে।
মাঘ রঘু নৈষধ পড়িল হরষিত,
পিঙ্গল[৩] পড়িতে বড় মনে পাইল প্রীত।

রাজ-দরবারে চাকুরিপ্রার্থী কায়স্থসন্তানকে বাংলা, অল্পস্বল্প সংস্কৃতের সঙ্গে নাগরী, আর ফারসী পড়তে হত। পশ্চিমবঙ্গের ছেলেরা উপরন্তু উড়িয়াও শিখে রাখত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে দক্ষিণরাঢ়ের নরসিংহ বসু তাঁর আত্মপরিচয়ে বলেছেন যে অল্পবয়সে পিতৃহীন হলে তাঁর পিতামহী তাঁকে

পিতৃ-ব্যবহারে পালিল যত্ন করি,
বাঙ্গালা ফারসী উড়্যা পড়াইল নাগরী।

---

[১] অমরকোষ। [২] জুমরনন্দীর টীকা সমেত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ।
[৩] পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র অথবা প্রাকৃত-পৈঙ্গল।

তহশিলের কাজের জন্য অঙ্ক শেখা কায়স্থসন্তানের পক্ষে আবশ্যিক ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শুভঙ্করী গণিতের যে-সব ছোট-বড় আর্য্যা লেখা হয়েছিল তা মুখ্যত কায়স্থবালককে উদ্দেশ করে। যেমন বিজয়রামের 'সেহাখত-সন্ধান'-এর

সারদার পদযুগে প্রণতি বিস্তর,
তারপরে বন্দিব ঠাকুর শুভঙ্কর।
শুনহ কায়স্থশিশু সেহাখত-সন্ধান,
চারি বেগনায় হয় উরথ প্রমাণ।

সেকালের কঠিনতম গণিত-প্রশ্নে প্রায়ই কায়স্থ-বালকের চাতুর্য্যপরীক্ষার চেষ্টা হয়েছে। যেমন,

মহীতে বসেছে পক্ষ আহারের তরে,
শঙ্কর কহিল ভুজ জোড় করি শিরে।
বসুর কাছে বাণ বস্যাছে কৃষ্ণ বড় সুখী,
ঘোড়ার উপর রাম বস্যাছে বেদে সমুদ্র দেখি।
রসের কাছে পাখি বসেছে খাবে হেন বাসি,
তার কাছে পঞ্চানন কোলে করি শশী।
অনূপচন্দ্র ভট্ট কহে শুন কায়স্থের বালা,
সকল চাঁদের মধ্যে রন্ধ্র তবে গাঁথিবে মালা।

১৩

দেশের প্রধান সম্পদ ছিল ধান। ধানের দর ওঠা-নামায় দেশের আর্থিক অবস্থার নির্দ্দেশ পাওয়া যেত। হরিদাস কুলিয়ায় উচ্চস্বরে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন আরম্ভ করায় সেখানকার বিশিষ্ট লোকেরা ভেবেছিল যে এতে দেশের অকল্যাণ হতে পারে। তাই তারা ঠিক করে রেখেছিল,

যদি ধানে কিছু মূল্য চড়ে,
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে।

দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত যথাসম্ভব অবাধে। খেয়াঘাট ছাড়া অন্যত্র শুল্ক আদায়ের তেমন ব্যবস্থা ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীতে পোর্তুগীসদের সঙ্গে কারবারেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে পোর্তুগীসদের ব্যবসা লুটেরই নামান্তর ছিল। শ্রীচৈতন্যের একজন বিশিষ্ট অনুচর শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার একবার ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে কারবার করতে গিয়ে ফেসাদে পড়েছিলেন। শিষ্য কবি লোচনদাসকে লুঠেরাদের কাছে গচ্ছিত রেখে তবে তিনি খালাস পান। রামগোপাল দাস লোচনের প্রশংসায় লিখেছেন, "গুরুর অর্থে বিকাইল ফিরিঙ্গির হাথ"।

পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের সঙ্গে বাংলার ব্যবসায়-সম্বন্ধ ছিল। বাংলাদেশের সুতি ও রেশমি কাপড়ের আদর ছিল উত্তরভারতের সর্ব্বত্র। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মিথিলার জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য পট্টাম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের "মেঘ-উডুম্বর", "গঙ্গাসাগর", "লক্ষ্মীবিলাস" এবং "গাঙ্গোর", "শিলহটী", "দ্বারবাসিনী" প্রভৃতি পট্টাম্বরের এবং "বঙ্গাল" প্রভৃতি নির্ভূষণ বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।

আলোচ্য যুগে ব্যাপকভাবে সমুদ্রবাণিজ্য হত বলে মনে হয় না। তবে সমুদ্রতীরবর্ত্তী অঞ্চলে coastal trade ভালরকমেই চলত। চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে যে সিংহল-পাটনে বাণিজ্যযাত্রার বিস্তৃত বর্ণনা পাই তাতে অবশ্য প্রধানত পূর্ব্বস্মৃতির উপর রোমান্সের রঙ ফলানো হয়েছে। সমুদ্রযাত্রা যেটুকুও ছিল তা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে গঙ্গার মোহানা অঞ্চলে পোর্তুগীস জলদস্যুদের অত্যাচারে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ধনপতি-শ্রীপতির বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম লিখেছিলেন যে গঙ্গার মোহানায় জলদস্যু ফিরিঙ্গিদের আড্ডা ছিল বিশেষ ভয়ের স্থান,

> ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে,
> রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে।

দেড়শত বৎসর পরে নরসিংহ বসু লিখেছেন,

তমোলুক দক্ষিণে সম্মুখে সোনজড়া,
রাতারাতি পার হৈল ফিরিঙ্গীর পাড়া।

নৌকা তৈরী হত নানাধরণের। দৈর্ঘ্য হিসাবে নাম রাখা হত—"বিশহাথী", "বাইশা", "পঁচিশা", "আঠাইশা" ইত্যাদি। গলুইয়ে বিভিন্ন জন্তুর মুখ খোদাই করা থাকত, সেই অনুসারেও নৌকার নাম হত—"সিংহমুখী", "ব্যাঘ্রমুখী", "ঘোড়ামুখী", "হংসমুখী", "নাগফণী", "শঙ্খচূড়" ইত্যাদি। যুঝারু নৌকার নাম রাখা হ'ত "দুর্গাবর", "রণজয়", "নরভীমা" ইত্যাদি। "চন্দ্রপান", "হীরামুখী", "চন্দ্রকরা", "নাটশালা" প্রভৃতি নাম সাধারণত সুসজ্জিত বিলাসতরণীরই রাখা হত। সদাগরী নৌকার সাধারণ নাম ছিল "মধুকর", অন্তত মঙ্গলকাব্যে এইরকমই পাই।

সমুদ্রগামী বড় নৌকাকে বলত "বুহিত" (< বহিত্র)। বুহিতে থাকত এইসব নাবিক—"নিজিরাগণক" বা "দিশারু", "তারাবিদ" (যে রাত্রিতে তারা দেখে দিক্‌নির্ণয় ক'রত), "কর্ণধার", "বাহক", "পবনবেত্তা" (যে বায়ুর গতি নির্ণয় করত), "গাবর" বা "নাউড়্যা" (সাধারণ নাবিক বা লস্কর), "যানশিল্পী" ইত্যাদি।

১৪

সেকালের নটীনৃত্যের কথা অন্যত্র বলেছি।[১] যাত্রা-অভিনয়ের প্রথম উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাই চৈতন্যভাগবতে। নিত্যানন্দ-প্রভুর বাল্যক্রীড়া প্রসঙ্গে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রামায়ণ-নাটের সুন্দর বর্ণনা আছে। এক ভাবতন্ময় নাটুয়া দশরথের ভূমিকা অভিনয় করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছিল, এই প্রবাদের উল্লেখ করেছেন বৃন্দাবন-দাস,

পূর্ব্বে দশরথ-ভাবে এক নটবর,
রাম বনবাসী শুনি এড়েন কলেবর।

---

[১] প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী দ্রষ্টব্য।

রামলীলা-শ্রবণদর্শনে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সমান প্রীতিলাভ করত। বৃন্দাবন-দাস একথা বার-বার বলেছেন,

যেন সীতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে,
নির্ভরে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে।

অথবা

যবনেহ যার কীর্ত্তি শ্রদ্ধা করি শুনে,
ভজ হেন রাঘবেন্দ্র-প্রভুর চরণে।

মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে শ্রীচৈতন্য তাঁর অনুচরদের নিয়ে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেছিলেন। তারও বর্ণনা বৃন্দাবন-দাস দিয়েছেন।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাটগীত কি রূপ নিয়েছিল তার কোন নিদর্শন বা বা উল্লেখ পাই না।

পাঁচালী কথাটির উদ্ভব হয়েছে সংস্কৃত "পঞ্চালিকা" শব্দ থেকে। অর্থ "পুত্তলিকা, খেলার বা নাচের পুতুল"। প্রাচীন বাংলা কাব্যমাত্রেই (পদাবলী ও গান ছাড়া) ছিল পাঁচালী। এই গান গাইত মূল গায়েন এক হাতে চামর অপর হাতে মন্দিরা নিয়ে আর পায়ে নূপুর পরে। তাল দেওয়া হত মৃদঙ্গের। সাধারণত দুজন করে "পালি" অর্থাৎ দোহার থাকত। মনে হয়, খুব পুরানো কালে পুতুলনাচের সঙ্গে "মঙ্গল" গান গাওয়া হত বলে পরে এই কাব্যগীত পাঁচালী নামে খ্যাত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে "পাঁচালী গান" বলে একরকম নোতুন পদ্ধতির চলন হয়। এ হচ্ছে যাত্রা আর পুরাতন পাঁচালীর মাঝামাঝি বস্তু। এই নোতুন পাঁচালীতে দুটিমাত্র ভূমিকা ছিল, নারদ মুনি (বা নারদ গোঁসাই বা মুনি গোঁসাই) আর বাসদেব বা বাসুদেব (অর্থাৎ ব্যাসদেব)। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষকালে লেখা একটি বই থেকে সেকালের পাঁচালী-গানের একটু নিদর্শন দিচ্ছি।

রাগিণী ঝুমুর ॥ তাল খেমটা ॥

এই কলঙ্কভঞ্জনের কথা শুনি নারদমুনি ॥ ধুয়া ॥
বাসুদেব সঙ্গে করিয়া আসিল অবনি ॥ পরধুয়া ॥

অগ্রবনে থাকি মুনি বাসুকে পাঠান,—
কোথায় আছেন কৃষ্ণ আনহ সন্ধান,
দেখা হইলে মোর কথা কবা তুমি এই করি যোড় পাণি ॥

বাসু কহে—কোন কৃষ্ণ কিবা রূপ ধরে,
জাতিকুল কহ তার থাকে কার ঘরে,
জনমিয়া দেখি নাই তারে বল কেমন কর্‌্যা চিনি ॥

মুনি কহে—নীলকান্ত জিনি রূপ তার,
আভীর জাতির মধ্যে আছেন এবার,
বৃন্দাবনে বাস তার নন্দঘরে যার মাতা নন্দরাণী ॥

বাসু কহে—কোন মুখে যাব মহাশয়।
মুনি কহে—নন্দগ্রাম ঐ দেখা যায়।
পাথেয় পয়সা দিলেন তাহারে বাসু চলিল তথনি ॥

বৃন্দাবন-পথ ভুলি যায় দিল্লি পানে।
পথ দেখাইল মুনি জ্ঞান-অন্ধ জনে।
নাচিতে নাচিতে আসি বৃন্দাবনে আসিয়া হেরিল সে নীলমণি ॥

তরজা বহুকাল থেকেই প্রচলিত আছে শুধু লোকচিত্তবিনোদনে নয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গরূপেও। বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে ব্রহ্মোদ্যের নিদর্শন আছে তা তরজারই প্রাচীনতম রূপ, এবং সে নিদর্শনেও সুরুচির পরিচয় নেই। ধর্ম্ম-ঠাকুরের গাজনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল অনুরূপ বাকোবাক্য। তার থেকে চড়ক-অনুষ্ঠানে এই রীতি এসে গেছে। নাথ-গীতিকায় দেহতত্ত্ব-বিষয়ক তরজা পাওয়া যায়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতেও যে এইরূপ তরজা

প্রচলিত ছিল তা চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত থেকে জানা যায়। যেমন,

আর্য্যা-তর্জ্জা পড়ে সবে বৈষ্ণব দেখিয়া।

অথবা

মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ,
আমিহ না জানি তার তরজার অর্থ।

তর্‌জা ভেঙে হয় "দাঁড়া কবি" সম্পূর্ণভাবে লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। পাঁচালী যেমন "পা-চালি" থেকে হয় নি, "দাঁড়া কবি"-ও তেমনি "দাঁড়ানো" থেকে আসে নি। দাঁড়া শব্দের প্রাচীন অর্থ ছিল "আদর্শ, বাঁধাধরা", যা ছিল আরবী তর্‌জা শব্দের মূল অর্থ। যে কবি-গানে উত্তর-প্রত্যুত্তরের ধরাবাঁধা পালা বা গান ছিল তাকেই বলা হত "দাঁড়া কবি"। আর যেখানে পালা বা গান উপস্থিতমত রচনা করা হত তাকে বলত সাধারণ কবি বা "কবি-গান"। কবি-গানের প্রত্যুৎপন্ন বা ex tempore পদ্ধতি চলিত হলেই তবে পূর্ব্বতন পদ্ধতি "দাঁড়া কবি" নামে পরিচিত হয়েছিল।

উত্তর-প্রত্যুত্তর কবিগানের সর্ব্বস্ব। উত্তর-প্রত্যুত্তরের কোন কোন গানে আদিরসের আধিক্য এনে বৈচিত্র্য-সঞ্চার করা হলে সেই সেই গানকে বলত "খেউড়"। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শান্তিপুর-অঞ্চলের কবি-গান, বিশেষ করে খেউড় গান, বিখ্যাত হয়েছিল,—একথা ভারতচন্দ্রের উক্তি থেকে জানা যায়।

১৫

মোগল শাসনে বাংলাদেশের দ্রুত অবনতি ঘটছিল, অন্তত আর্থিক অবস্থায়। দেশের ধনসম্পদ চলে যাচ্ছিল দেশের বাইরে, আর দেশের ভিতরেও লোকের দেহে মনে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল। দু-বেলা ভাত আর পরনের একটুকরা কাপড় পেলেই সাধারণ লোক কৃতার্থ হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য কুলীন-ব্রাহ্মণের যে সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ খাড়া করেছেন তাতে দেশের আর্থিক দুর্গতি হয়েছে মুখর,

কুলীনের পোকে অন্য কি বলিব আমি,
কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা করো তুমি।
আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত,...

আর পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে মুখ ফিরোলে তখনকার সাংসারিক জীবনের কামনা দেখি ঐশ্বর্য্যোজ্জ্বল,

তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে,
দশ-বিশ জন যার আগে পাছে নড়ে।

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসার এর জন্যে কতকটা দায়ী হতে পারে। তবে আসল হেতু হচ্ছে মোগল-শাসনে দেশের অত্যধিক শোষণ ও তার ফলে ক্রমবর্দ্ধমান অবনতি॥

। ১৩৫০ ।

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭, জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

। ১৩৫১ ।

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : শ্রীরজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ